নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২, নারিকেল বাগান লেন
কলিকাতা।

মূল্য—দশ আনা

প্রকাশক :—
শ্রীসলিলকুমার মিত্র
এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২, নারিকেল বাগান লেন
কলিকাতা।

আশ্বিন—১৩৪৬

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীমাধব প্রেস।
৩১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যাদুকর ভোজবাজি দেখায়। একটি আমের আটি পোঁতা হইল, গাছ বাহির হইল, ফল ধরিল, লোক চক্ষুর সমক্ষে কয়েক মিনিটের মধ্যে এই সব ঘটিয়া গেল। খালি হাত মুঠা করিল, হাতের মধ্যে জ্যান্ত পাখি কোথা হইতে আসিয়া ছট-ফট করিল। লোকে এই সব ইন্দ্রজাল দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যায়। সকলেই কিন্তু জানে যে এ সব হাতের কারসাজি মাত্র—সমস্তই অলীক। কিন্তু অলীক নয় অথচ ইন্দ্রজালের অপেক্ষা বিস্ময়কর হইল বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের ক্রিয়াকলাপ। ইহা রূপকথাকেও হার মানাইয়াছে।

রূপকথার ভিতর দিয়া শ্রীমান নীহার রঞ্জন গুপ্ত বিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। রূপকথা যে সকল তরুণ মনকে আলোকিত করে এই সকল কাহিনী সেই মনের উপর ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিবে। আর এই পাথেয় লইয়া যাত্রা করিলে পরে তাহাদের বিজ্ঞান সাধনার পথ সুগম হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীচারু চন্দ্র ভট্টাচার্য

উৎসর্গ

আমার অনুজ

শ্রীমান্ সুশীলরঞ্জন গুপ্ত বি, এ,

কল্যাণীয়েষু—

'দাদা'

—আমার কথা—

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে আজ সমগ্র জগৎ কতভাবেই উপকৃত হয়েছে সে কথা ভাবতে গেলেও বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

*

বিজ্ঞানের কথা অবশ্য ইতিপূর্ব্বে অনেকেই নানা ভাবে বলেছেন ও জানিয়েছেন এবং ছোটদের জন্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক বই এ যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে ও এখন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হয়ত হবে। কিন্তু তথাপি আমার মনে হয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে যতই বলি না কেন তবু যেন কিছু বাকী থেকে যায়; যতই শুনিনা কেন তবু যেন সে শোনার শেষ হতে চায় না।

*

আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে মোটা মুটি করে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক-দের রহস্যময় জীবনী সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলতে চেয়েছি মাত্র। এর থেকে যদি কারও বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের কথা আরও ভালকরে জানবার ইচ্ছা জাগে তবেই আমার এ শ্রম সার্থক হবে!

*

বইখানিতে আমি 'আলো' ও তার উৎপত্তি, বিদ্যুৎ ও তার ক্রমোন্নতি, (Glass) কাচ ও তার প্রস্তুত প্রণালী এবং ব্যবহার; সজীব আলো কী? Ultraviolet Ray এবং Radium ও তাহাদের উপকারিতা, উল্কা বা Shooting Star কী? ধূলা dust কোথা হতে কেমন করে এলো! Electroplating ও তার প্রণালী প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছি মাত্র।......

*

সর্ব্বশেষে বন্ধুবর শিল্পী নরেন্দ্র দত্ত, সুধীর কুমার বসু, বি, এস্, সি, চারু চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও যোগেশ চন্দ্র বাগল—যাঁরা এই পুস্তক রচনা কালে আমায় নানা ভাবে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন তাঁদের আমার শত সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি!

বিনীত—

লেখক।

-এক-

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে ঝম্ ঝম্ করে।
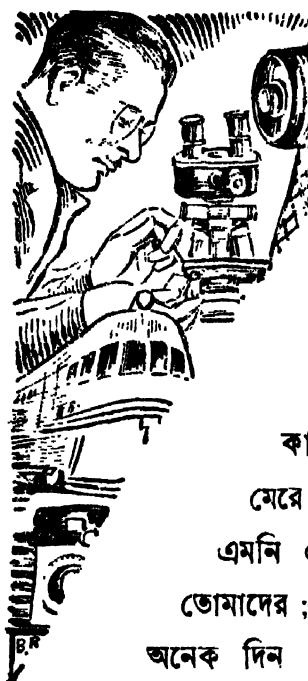
কড়্ কড়্ কড়াৎ মেঘের আড়ালে বজ্র হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—বুকের মাঝে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

কালো আকাশের গায়ে বিদ্যুৎ চমক্ মেরে চোখ ঝল্সে দিয়ে যায়।

এমনি এক বর্ষা রাতের কথা বলবো আজ তোমাদের ;—

অনেক দিন হয়ে গেল, এক দেশে ছিল এক রাজা। এ সংসারে তার আপনার বলতে একটা মাত্র মেয়ে—মেঘমালা।

রাজার বড় আদরের মেয়ে।

বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল

সেই রাজ্যের সীমান্তে বন পার হয়ে বিশাল এক পাহাড়েরই পরে বাস করত এক দৈত্য।···দৈত্য দেখতে ছিল যেমন কুৎসিৎ মনটাও তেমনি হিংসায় ভরা !···

পাহাড়ের নীচে ছিল প্রকাণ্ড এক সরোবর।...সেই সরোবরের বুকে—অসংখ্য শ্বেত পদ্ম সারা বছরই লাখে লাখে ফুটে থাকত এবং সেই সরোবরের ধারে ছিল মহাকালের মন্দির !

প্রত্যেক মাঘী পূর্ণিমাতে দেশের কুমারী মেয়েরা মনোমত পতি লাভের জন্যে মহাকালকে পূজো করতে আসতো !

সখীদের সঙ্গে মেঘমালাও সেবারে মাঘী পূর্ণিমায় মহাকালের পূজো দিতে এলেন !···

অজস্র চাঁদের আলো আকাশের বুক হতে ঝরে পড়্ছে।

রাতের মৃদু মন্দ হাওয়ায় কত কত পদ্ম সরোবরের বুকে হেল্‌ছে দুল্‌ছে !···

সহসা কোকিলের কুহু রবে পর্ব্বত গুহায় নিদ্রিত দৈত্যের ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে দৈত্য গুহার বাইরে এসে দাঁড়াল !

চাঁদের আলোয় বুঝি একটা নেশা আছে; দৈত্যের প্রাণের মাঝে কি জানি একটা অজানা পুলকে দোলা দিয়ে গেল !

সহসা এমন সময় তার নজড়ে পড়ল, ঐ নীচে সরোবরের পাষাণ সোপানে বসে মেঘের মত চুল এলিয়ে এক পরমাসুন্দরী কন্যা বিনি সূতোয় পদ্ম কোরকের মালিকা গাঁথছে। যেন ঘুমের ঘোরে এক টুক্‌রো স্বপ্ন পৃথিবীর মাটিতে এসে ঠিক্‌রে পড়েছে।···

দৈত্যের প্রাণে এক বাসনা জাগল, ঐ মেয়েটীকে যদি পাওয়া যায় তবে এ সত্য সত্যই তার মনের মত রাণী হবে ; যেমনি ভাবা তেমনি কাজ।

আর কাল বিলম্ব না করে দৈত্য সোঁ করে নীচে নেমে তার বিশাল দুহাতের মুঠোর মধ্যে এক স্তবক ফুলের মতই মেঘমালাকে তুলে নিলে। একটা দীর্ণ আকুল চীৎকার রাত্রির সুগভীর স্তব্ধতায় নিঝুম চাঁদের আলোর মাঝে জেগে উঠে মিলিয়ে গেল। সঙ্গি ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা এসে রাজার কাছে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল! মনের দুঃখে রাজা শয্যায় আশ্রয় নিলেন ; রাজা ঘোষনা করলেন, যদি কেউ পাহাড়বাসী দৈত্যের হাত হতে রাজকন্যাকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারে তবে তার হাতে সমস্ত রাজত্ব ও রাজকুমারীকে তুলে দেবেন।

কত তরুণ রাজারকুমার রাজকুমারীর মুক্তির জন্য জীবন পণ করে দৈত্যের কাছে গেল, কিন্তু কেউই এলো না ফিরে!...

শুধু রক্তের লিখায় রাজকুমারীর মুক্তি ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাদের চিরবিদায়ের কাহিনীটুকু রয়ে গেল।...

তারপর একদিন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে এক তরুণ কুমার এসে ডঙ্কায় ঘা দিল! বৃদ্ধ শোক জর্জ্জরিত রাজা বেরিয়ে এলেন,—কি চাও!

আমি তোমার মেয়েকে উদ্ধার করে আনব! আমার নাম বিদ্যুতকুমার। বড় দুঃখে রাজার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু বিদ্যুতকুমারের মুখের দিকে চেয়ে যেন তাঁর ভাঙ্গা বুকে একটু আশা উ কি দিয়ে গেল।...

বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল

উন্নত বিশাল বক্ষ !…মাথায় সোনার মুকুট ! হাতে প্রকাণ্ড একটা চাবুক ! কোমরে তরোয়াল !

বিদ্যুৎ কুমার দৈত্যের উদ্দেশে যাত্রা করলে !

পাহাড়ের সানু দেশে এসে যখন বিদ্যুতকুমার পৌঁছল, সমস্ত আকাশ জুড়ে তখন লাখো লাখো মেঘের খেলা চলেছে !

একটু পরেই ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল !…নিকষ কালো আঁধারে চারিদিক ভরে গেছে ।…সবেগে হাতের চাবুক বিদ্যুত-কুমারের মাথার পরে ঘুরছে ;…সোনালী আলোর মত সেই চাবুক আঁধারের বুকে ঝিক্ মিক্ করে ওঠে । বিদ্যুতকুমারের সাড়া পেয়ে দৈত্য হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে এল, তার পর তুজনে আরম্ভ হলো বিষম যুদ্ধ !…

দৈত্য দেখলে এবার বড় কঠিন হাতে পড়েছে, সে এক ছুটে গিয়ে মেঘমালাকে পিঠের উপরে তুলে নিয়ে মেঘের ভিতরে গিয়ে লুকাল,—বিদ্যুতকুমারও চাবুক হাতে ঘোড়ায় চেপে তাকে কর্‌ল তাড়া ! দৈত্য ছুট্‌ছে, রাজকুমারও তার পিছু পিছু চলেছে । মাঝে মাঝে তার হাতের চাবুক সপাং করে দৈত্যের পিঠের ওপর গিয়ে পড়ছে আর দৈত্য ভীষণ রাগে গর্জ্জন করে উঠ্‌ছে !…তার পর কত কাল চলে গেছে আজও দৈত্য দিক হারা হয়ে আকাশের পথে মেঘমালাকে পিঠে নিয়ে ছুট্‌ছে আর বিদ্যুতকুমারও চাবুক হাতে তাকে তাড়া করে ফির্‌ছে ।…তাইতেই যখনই মেঘে মেঘে আকাশ যায় ছেয়ে ; বিদ্যুতকুমারের হাতের

সোনালী চাবুক অন্ধকারের বুকে লক্ লকিয়ে ওঠে আর দৈত্য হুঙ্কার দিয়ে ওঠে কড়্ কড়্ কড়াৎ…পৃথিবীর লোক কেঁপে ওঠে !…বিদ্যুতকুমারের মা বাপ সবাই ছেলের শোকে পাগল হয়ে গেল ! বিদ্যুৎ ! বিদ্যুৎ ! ক'রে তারা ডাকাডাকি করলে কিন্তু সে আর ফিরে এল না !…

সকলে তখন চিন্তা করতে লাগল বিদ্যুৎকে কেমন করে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায় !

কত জনে কত উপায়ই না ভাবলে, কিন্তু কোনটাই সফল হ'লো না ! সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বিদ্যুৎ কুমার দৈত্যের পিছু পিছু আকাশ পথেই ছুটা ছুটি করে বেড়াতে লাগল !

ক্রমে মানুষ কত নূতন নূতন উপায়ই না ভাবলে, কিন্তু সফল আর হতে পারে না ;…এমনি করে কতকাল কেটে গেল ; তারপর সে প্রায় এখন হ'তে অনুমান আড়াই হাজার বছর আগে, পৃথিবীর মধ্যে গ্রীকজাতি প্রথম লক্ষ করলে যে একখণ্ড এ্যম্বার বা তৃণমণি ঘষে হাতের আঙ্গুলে ছোঁয়ালে এক প্রকার আগুনের ফুলকী দেখা যায়। সেই আগুনের ফুলকী অনেকটা সেই আকাশ-চারী হারিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের হাতের চাবুকের সোনালী আলোর মত। কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারটা যে এ্যম্বারের মধ্যে বিদ্যুৎ জন্ম নেবার জন্যই হচ্ছে তা কিন্তু কেউই তখন জানতে পারলে না বা বুঝতে পারলে না। কিন্তু তারা সকলে এই আলোর ফুলকীর নাম দিল Electricity বা বিদ্যুৎ ! গ্রীক ভাষায়ও এ্যম্বারকে বলত Electrone। যেহেতু এই অদ্ভুত আলোর ফুলকীর উদ্ভব

এ্যাম্বার হতে হচ্ছে, সেই জন্যই গিলবার্ট এর নাম রাখলেন ইলেকট্রিসিটি (Electricity)।

গিলবার্ট ছিলেন যেমন তীক্ষ্ণধী তেমন মেধাবী ! তিনি ছিলেন রাণী এলিযাবেথের ডাক্তার ! তৃণমনি বা এ্যাম্বারকে স্লিকের সাথে ঘষলে বিদ্যুৎ তৈরী হয় যখন দেখলেন, তখন তাঁর ইচ্ছা হ'লো বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আরও ভাল করে জানতে এবং সেই থেকে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণা স্বুরু করে দিলেন।

তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন ; শুধু 'এ্যাম্বারই' নয় ; বিদ্যুতের জন্ম অন্য পদার্থের সংযোগেও ঘটে ; এবং সেগুলি হচ্ছে কাঁচ (Glass). গন্ধক (Sulphur), রেজিন প্রভৃতি। এই পর্য্যন্ত জেনে আর কিছু জানতে পারেননি। এবং তিনি ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে মারা যান।

গিল্‌বার্টের মারা যাওয়ার পর বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণা করতে লাগলেন একজন আইরিশ ম্যান। তাঁর নাম হচ্ছে রবার্ট বয়েল। ১৬২৭ খৃঃ ম্যানচেষ্টারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাত্র দশ বৎসর বয়েসের সময়ই সমগ্র এ্যালজাব্‌রা (Algebra) তিনি আয়ত্ব করে ফেলেছিলেন। নানা কাজ নিয়ে সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকাই ছিল তাঁর স্বভাব। কখনও চুপ করে ভূতের মত বসে থাকা মোটেই তাঁর ধাতে সইত না। রবার্ট বয়েলই বিখ্যাত Air pump আবিষ্কার করেন। এবং বায়ু সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় নূতন কথা সকলকে বলে

যান। ১৬৯১ খৃঃ বয়েল মারা যান। সেই সময় গ্যারিক (Guericke) নামে একজন বৈজ্ঞানিক নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ইংলণ্ডে এসে হাজির হন। তিনি ১৬০২ খৃঃ রবার্ট বয়েলের আগেই নাকি Air Pump আবিষ্কার করেছিলেন ; কিন্তু পরে বয়েলের নূতন ধরণের Air Pump এত বেশী কার্য্যকরী ও সুবিধা জনক হল যে, গ্যারিক যে Air pump বের করেছিলেন তার কথা শীঘ্রই সকলে ভুলে গেল! এমনি হয়েছিল বিনা তারে সংবাদ দেওয়া নেওয়া অর্থাৎ wireless systemএর আবিষ্কার করবার গোড়ার ইতিহাসে। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্রের দানের কথা মার্কনির নামের চাপে ভাবতেও বোধ হয় সকলে ভুলে গেছে। অনেক মুল্যবান আবিষ্কার হয় ত, অনেক সময় নানা রকম বাধার জন্য বানচাল হবার উপক্রম হয়— সেই সময় যাঁদের বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও একাগ্রতা পথের সন্ধান এনে দেয়, ভাগ্যলক্ষী তাঁদেরই গলায়ই বিজয়মাল্য দুলিয়ে দেন! যাহোক গ্যারিকই প্রথম দেখান যে, হাওয়া শূন্য Vacuumএর কী অদ্ভুত ক্ষমতা বা শক্তি! তিনি ধাতু দিয়ে দুটো প্রকাণ্ড বাটীর মত তৈরী করলেন, এবং এমন ভাবে সেই বাটী দুটো তৈরী হল যে তাদের যখন মুখো-মুখি লাগান হবে তখন একেবারে মুখে মুখে জোড় লেগে যাবে ; প্রত্যেক বাটীর গায়ে একটা করে ছিদ্র করলেন,—এবং Air pumpএর সাহায্যে সেই ছিদ্র দিয়ে বাটীর মধ্যস্থিত সমস্ত হাওয়া বের করে নিলেন! তখন সেই হাওয়া শূন্য বাটী দিয়ে তিনি যে অসাধ্য সাধন

করলেন তা সত্যই চমকপ্রদ। এখন দুটো বাটীকে মুখো মুখি জোড় লাগান হল, তার পর সেই গোল হাওয়া-হীন বাটীর দু'দিকে ১৫ টা ১৫টা করে ত্রিশটা ঘোড়া জুতে দিয়ে টানতে আদেশ দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! দেখা গেল বাটী দুটো যেমনি মুখে মুখে লেগেছিল, তেমনিই পূর্ব্বের মত মুখো মুখি লেগে রইল, কোন মতেই পৃথক করা গেল না। এইভাবে গ্যারিক Vacuumএর অদ্ভুত ক্ষমতা প্রমাণ করে সমগ্র জগতকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে দিলেন!

আজ আমরা ঘরে ঘরে যে বিদ্যুতের আলো দেখতে পাই সেটা সর্ব্ব প্রথমে আবিষ্কার করেন বৈজ্ঞানিক গ্যারিক। তারপর যাঁর নাম মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন ফ্রানসিস্ হক্‌স্‌বি Francis Hawksbee. ১৭৭৩ খৃঃ তিনি হাওয়া ও পারদ নিয়ে গ্লাস রড্‌কে ঘষে ইলেকট্রিসিটি (বিদ্যুৎ) উৎপন্ন করে নানা গবেষনা করেন এবং তিনিই প্রথম বিদ্যুৎ স্ফুরণ Electric spark আবিষ্কার করেন এবং এও বলেন যে এই ভাবে বিদ্যুৎ স্ফুরণের সময় যে একটা শব্দ জাগে সেটা বজ্রের শব্দের সঙ্গে নাকি অনেকটা মিলে যায়। তার পর তাঁর পুত্রও অনেক রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন! এই ভাবেই একটু একটু করে দিনের পর দিন বিদ্যুতের গবেষণা এগুতে লাগল। ক্রমে মানুষ ভাবতে সুরু করলে কেমন করে এই বিদ্যুৎকে কাজে লাগান যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দিতে Stephen Gray নামে লণ্ডনের

একটী ছেলে তাঁর গবেষণার দ্বারা বস্তুকে দুইভাগে ভাগ করলেন। যে সব বস্তুকে ঘষে তার মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চার করা যায় তাদের নিয়ে একভাগ করলেন—আর যাদের ঘষে তাদের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চার করা যায় না তাদের নিয়ে অন্য একভাগ করলেন। আরও একটা জিনিষ তিনি প্রমান করলেন যে, বিদ্যুৎ সঞ্চারিত বস্তুর সঙ্গে যদি বিদ্যুৎহীন অন্য একটী বস্তুকে ছোয়ান যায় তবে তাতেও বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়। এর থেকেই পরে দুই রকম বস্তু জগতে আবিষ্কৃত হলো—বিদ্যুৎ আকর্ষণকারী Conductor of Electricity. এবং বিদ্যুৎ আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা হীন Non conductor of Electricity. আরও দেখতে লাগলেন এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় বিদ্যুতকে চালিয়ে দেওয়া যায় কিনা! এবং নানা ভাবে পরীক্ষা করতে করতে অবশেষে এক বাণ্ডিল সূতো নিয়ে পরীক্ষা সুরু করে দিলেন—এবং দেখলেন যে সূতোর সে ক্ষমতা আছে! তখন তিনি করলেন কি সূতোর গায়ে সিল্ক সূতা জড়িয়ে নিলেন—যাতে করে বিদ্যুৎ সূতোর গা হতে না চলে যায়। এই ভাবে তিনি সূতোর ভিতর দিয়ে প্রায় ৮৮৬ ফিট পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চালনা করতে পেরেছিলেন! গ্রের মৃত্যুর পর Dufray ১৭৯৩ খৃঃ আবিষ্কার করলেন বিদ্যুৎ সঞ্চারিত সেই সূতোর বাণ্ডিলের ওপর যদি কোন মানুষ হাত দেয় তবে সেই সূতোর বাণ্ডিল হতে বিদ্যুৎ মানুষের শরীরেও সঞ্চালিত হয়। এবং এই বিদ্যুৎ মানুষের

শরীরে সঞ্চালিত হবার সময় একটা শব্দ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গও দেখা যায়! এই সব জিনিষ দেখে মানুষ ভাবতে লাগল বিদ্যুতের নিশ্চয়ই কাছে টেনে নেবার ও সেই সঙ্গে দূরে ঠেলে দেবার বোধ হয়, একটা ক্ষমতা আছে। এবং বিদ্যুতের ভিতরে দুরকমের বিদ্যুৎ আছে। ধনাত্মক (positive) ও ঋণাত্মক (negative)। আর একদল লোক ভাবলে যে বাইরে অর্থাৎ (open airএ) যেমন সহজেই বিদ্যুতকে তৈরী বা উৎপন্ন করা যায় সেই ভাবে বিদ্যুতকে যদি কোন মতে কোন বদ্ধ কাঁচের পাত্রের মধ্যে উৎপন্ন করা যায় তবে নিশ্চই সেই বিদ্যুৎ আরো শক্তিশালী হয়! কেননা সেই বিদ্যুৎ ইচ্ছা বা সুযোগ মত ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যুৎ সত্যই একদিন মানুষের কবলে ধরা পড়ল ও বন্দি হলো!

—দুই—

সেই সময় অনেক দূরে এক দেশে এক সন্ন্যাসী বাস করতেন এবং হলাণ্ডের অন্তর্গত লিডেন leydan সহরে মুস্‌চেন ব্রোক নামে এক অধ্যাপক থাকতেন। তাঁদেরও দু'জনের মাথায় একই সময় বিদ্যুৎকে এমনি করে বন্দী করে কাজে লাগাবার ইচ্ছা জাগে এবং তাঁদেরই চেষ্টার ফলে লিডেন জারের সৃষ্টি হয়। Leyden jar যদিও সর্ব্বপ্রথম Hollandয়েই তৈরী হয়, কিন্তু এ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে ইংলণ্ডে স্যার উইলিয়াম ওয়াট্‌সনের হাতে। Watson সামান্য একজন গরীব ব্যবসায়ীর ছেলে ছিলেন এবং ১৭১৫ খৃঃ ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন! তিনি এক রাসায়নিকের কাছে এপ্রেণ্টিস্ ভাবে কাজ করতেন। বিজ্ঞান ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয়, এবং এই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ভালবাসার জন্যেই পরবর্ত্তী জীবনে যখন তিনি প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পেই দান করে যান! তিনি Leyden jarয়ের চার পাশে টিনের তক্তি দিয়ে জড়িয়ে, এর আরো উন্নতি করেন,—এবং তিনি Leyden jar হতে 'তার' সংযোগ করে অন্য একটা Leyden jarএ বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে পর্য্যন্ত সক্ষম হয়েছিলেন!

একদিন এই ভাবে একটা লিডেন জার হতে 'তার' সংযোগ

করে অন্য একটা লিডেন জারে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করবার সময়ে ওয়াট্সন লক্ষ্য করলেন যদি বিদ্যুৎ-বাহী তারের অন্য দিকটায় হাত দেওয়া যায় তাহলে আগে যেমন Shock লাগ্ছিল এখনও তেমনি ঠিক Shock লাগে। এইটুকুতেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। বিদ্যুৎ সঞ্চালিত এক লিডেন জার হতে দুই মাইল দীর্ঘ একটি 'তার' সংযুক্ত করে পরীক্ষা করে দেখলেন ছোট তারের বেলাতেও যেমন Shock লেগেছিল এখনও ঠিক তেমনিই Shock লাগছে, এবং যে মুহূর্ত্তে Ledyen jar হতে বিদ্যুৎ 'তারে' সঞ্চালিত হয় মানুষের হাতেও Shockটা ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই লাগে! বিদ্যুতের এই মুহূর্ত্ত কার্য্যকরী ক্ষমতা হতেই পরে টেলিগ্রাফের জন্ম হয়। শুধু এই নয় বিদ্যুতের যে আরো অনেক ক্ষমতা আছে উইলিয়ম তাও প্রমাণ করেন। তিনি একখণ্ড বরফের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত করে সিগারেটে আগুণ ধরিয়েছেন, এবং এক ফোঁটা জলের মধ্যেও বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে দেখিয়েছেন জলের ভিতরেও বিদ্যুৎ সঞ্চালিত করা যায়; আরো কত কি!... এ সব দেখে শুনে মানুষ ভাবতে লাগলো যে এই বিদ্যুৎ দিয়ে নিজেদের অনেক কাজ করে নেওয়া যেতে পারে কি না? কিন্তু সেটা যে কেমন করে সম্ভব হতে পারে তা তারা বুঝে উঠ্তে পারছিল না! তবু হাল ছাড়লো না; চেষ্টা করতে লাগল। কথায়ই আছে 'উদ্যোগিণম্ পুরুষ সিংহম্'।

এই সময় আমেরিকার বস্টন সহরে ১৭০৬ খৃঃ বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন নামে এক মহাপুরুষ জন্মান, তিনিই জগতে প্রথম

আকাশ হতে বিদ্যুৎকে বন্দী করে পৃথিবীর মাটীতে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। তাঁর শিক্ষা খুবই সামান্য ছিল, তিনি তাঁর ভায়ের একটা ছোটখাটো ছাপাখানায় কাজ করতেন। অত্যন্ত গরীব ছিলেন তাঁরা! অর্থের দিক দিয়ে ভগবান তাঁকে বঞ্চিত করলেও বুদ্ধির দিক দিয়ে তাঁর প্রতি তিনি এতটুকু কার্পণ্যও করেন নি। এবং সেই জন্যই অর্থের সচ্ছলতা না থাকলেও অর্থের জন্য কোন দিনই তাঁর কষ্ট পেতে হয় নি! নিজের চেষ্টা ও যত্নে তিনি লেখা পড়া শিখলেন। প্রথমে তিনি একজন সামান্য প্রিন্টার ছিলেন, পরে ফিলাডেলফিয়ায় এসে একটা ছোট খাটো ব্যবসা স্থুরু করে দিলেন।

অন্যান্য কাজের মধ্যে ফাঁক পেলেই তিনি গবেষণা করতেন নানা বিষয় নিয়ে! তার সন্দেহ হয়েছিল নিশ্চয়ই মেঘলা আকাশের গায়ে বিজলীর চমক্ ও মানুষের তৈরী বিদ্যুৎ Electricity একই জিনিষ। এবং তিনি আরো প্রচার করলেন যে, আকাশের বজ্র হতে উৎপন্ন যে বিদ্যুৎ ও মানুষের এক্সপেরিমেণ্ট দ্বারা যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই আসলে দুটোই এক। কাজেই তিনি এখন যদি এইটা প্রমাণ করে দেখাতে না পারেন যে তাঁর কথাই সত্য তবে সমস্ত জগত তাঁর দিকে চেয়ে হাসবে এবং তাঁকে 'পাগল বলে উড়িয়ে দেবে! কাজেই এটা প্রমাণ করবার জন্য তিনি একদিন এক ঝড়ের রাতে একটা বেশ মজার ব্যাপার করলেন। একটা সিল্ক দিয়ে ঘুঁড়ি তৈরী করলেন, এবং সেই ঘুঁড়ির মাথায় ছোট একটা সরু

'তার' জুড়ে দিলেন, ঘুড়িটায় সুতো বেঁধে হাতের কাছটুকু সূতোর বদলে একটা সিল্কের রিবন রাখলেন এবং সেই সিল্ক রিবন ও সূতার সন্ধিস্থলে একটী ধাতুর চাবি বেঁধে দিলেন। বাইরে খুব ঝড় ও হাওয়া চলেছে, বেনজামিন ঘুড়িটা হাওয়ায় ওড়াতে সুরু করলেন। ঘুড়িটা আকাশে উড়িয়ে দিয়ে দরজার উপর দাঁড়িয়ে তিনি অধীর ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন—প্রথম 'বজ্রপূর্ণ মেঘ' (Thunder cloud) ঘুড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল কিন্তু বিশেষ কিছুই ঘটল না ; ফ্রাঙ্কলিন চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লেন—তবে কী তাঁর ধারণা ভুল !

দ্বিতীয় 'বজ্রপূর্ণ-মেঘ' চলে যাবার পরই কিন্তু তিনি লক্ষ করলেন যে সিল্ক রিবনের উপরের সূতোর অংশ যেন একটু শক্ত শক্ত লাগছে, তিনি সেই সূতোর দিকে হাত নিয়ে যেতেই দেখলেন হাতটাকে যেন কী একটা সূক্ষ্ম অদৃশ্য শক্তি টান্‌ছে। হঠাৎ এমন সময় তিনি লোহার চাবিটার গায়ে হাত ঠেকাতেই একটা Shock খেলেন ও সেই সঙ্গে একটা আগুণের ফুলকি দেখা দিল ! ঠিক সেই সময় বাইরে বৃষ্টি সুরু হলো ! ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, মাঝে মাঝে বজ্রের হুঙ্কার ও কালো মেঘের বুকে বিজলী চমক্ মেরে যাচ্ছে ! বৃষ্টির জলে ঘুড়ির সূতো গেল ভিজে, এবং সেই সূতো বেয়ে আকাশ হতে বিদ্যুৎ নেমে আসতে লাগল ! এবং সেই বিদ্যুতের পরিমাণ এত বেশী যে ফ্র্যাঙ্কলিন অনায়াসেই বিদ্যুৎ দিয়ে লিডনজার ভর্ত্তি করে নিলেন ! এমনি করেই তিনি প্রমাণ করলেন মানুষের তৈরী বিদ্যুৎ ও আকাশের

বজ্রের মধ্যে কোন তফাতই নেই! দুটোই এক!…ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুতের গবেষণা নিয়ে একেবারে মেতে উঠ্‌লেন। পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে তিনি প্রমাণ করলেন আকাশের পথে যে সমস্ত মেঘ চলাচল করে তাদের মধ্যে কতকগুলি মেঘ ধনাত্মক (positive) বিদ্যুতে পরিপূর্ণ আর কতকগুলি ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুতে পূর্ণ! এই জিনিষগুলি প্রমাণ করবার পর তার মনে হল আকাশের বজ্রকে ঘুঁড়ির সাহায্যে যখন মাটীতে নিয়ে আসা যায়—তখন ত' আকাশের বজ্র আপনা হতেও আকাশ হতে মাটীতে নেমে আসতে পারে। আর তাই যদি হয় অর্থাৎ এই ভাবে যদি বিদ্যুৎ খুসী মত আকাশ হতে নেমে আসে তাহলে বাড়ী ঘর দোর ত' আর কিছুই থাকবে না!…সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! তা হ'লে উপায়?

যাহোক এইভাবে বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণার কাজ এগুতে লাগল!

১৭৩১ খৃঃ হেন্‌রী ক্যাভেনডিস্‌ প্রমাণ করলেন লোহার মত বিদ্যুতকে আকর্ষণ করবার শক্তি আর কারও নেই! তারপর ১৭৪৪ খৃঃ বিজ্ঞান জগতে এলেন Volta ইনিই সর্ব্বপ্রথম ব্যাটারী সৃষ্টি করেন! এবং তাঁর এই সৃষ্টি সমগ্র সভ্য জগতে একটা বিষম চাঞ্চল্য এনে দেয়!

কিন্তু Voltaর আগে আর একজন ইতালীয়ান ডাক্তারের গবেষণা সম্বন্ধে একটা গল্প বলব! ইতালীয়ান ডাক্তারটীর নাম ছিল 'গ্যালভানি' তিনি একদিন একটা ব্যাঙের পেশী

নিয়ে পরীক্ষা (Experiment) করছিলেন ! সারাদিন পরীক্ষা করবার পরও যখন তিনি কিছুই বের করতে পারলেন না, তখন পাছে হাওয়া লেগে পেশীটা শুকিয়ে ওঠে তাই সেটা খানিকটা লবণ জলে (Saline Water) ডুবিয়ে একটা তামার 'তার' দিয়ে বারান্দার লোহার রেলিংটার গায়ে ঝুলিয়ে রাখলেন তারপর সামনেই টেবিলের উপর বসে চা খেতে খেতে আনমনে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন ! হঠাৎ এমন সময় অন্য-মনস্ক ভাবে সামনের দিকে চাইতেই একটা ভারী মজার ব্যাপার তাঁর নজরে পড়ল ! হাওয়া লেগে মাঝে মাঝে 'তার' দিয়ে ঝোলান পেশীটা একটু একটু দুলছিল, হঠাৎ এক সময় দোলা লেগে পেশীটা লোহার রেলিংয়ের সাথে ঠেকতেই সেই পেশীটা কুচ্‌কে ছোট হয়ে গেল ! আবার লোহার সংস্পর্শ হতে সরে আসতেই যেই কে সেই হয়ে গেল ! একবার দু'বার তিনবার প্রত্যেকবারই তিনি লক্ষ্য করলেন পেশীটা লোহার সাথে ছোঁয়া লাগলেই সেটা সঙ্কুচিত অর্থাৎ আকারে ছোট হয়ে যায়—লোহার কাছ হতে দূরে সরে এলেই আবার পূর্ব্বের আকার ফিরে পায় ; সেদিন অনেক চিন্তা করেও তিনি এর কারণ কিছুই বুঝতে পারলেন না ! কিন্তু লোহার গায়ে ছোঁয়া লাগতেই অমনি করে পেশীটা সঙ্কুচিত কেন হচ্ছিল জান ?—বেঙের পেশী লোহার রেলিংয়ে যেমন ঠেকছিল অমনি পেশীর মধ্যে সেই মুহূর্ত্তেই বিদ্যুৎ জন্মাচ্ছিল, এবং সেইজন্যই পেশীটা সঙ্কুচিত হচ্ছিল ; কিন্তু গ্যাল্‌ভানি জানতেও পারলেন না যে এটা মাংসপেশীটার

মধ্যে বিদ্যুতের জন্ম নেওয়ার জন্যই হচ্ছে! তারপর বহুদিন পরে Volta এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন! তিনি বল্‌লেন, একদিকে তামা, অপর দিকে লোহা ও মাঝখানে লবণ জল, এই তিনের সংযোগে বিদ্যুতের উদ্ভব হয়! ভেবে দেখ, মাংস পেশীটা তামার 'তারে' লবণ জলে ভিজিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, তাই লোহার সঙ্গে ছোঁয়া লাগতেই সঙ্কুচিত হচ্ছিল; Voltaর কথাই তবে মিলে গেল! তিনি করলেন কি একটা কাচের পাত্রে জল মিশ্রিত সালফিউরিক এ্যাসিড্ নিয়ে তার মধ্যে একদিকে একটা তামার পাতের ও অন্যদিকে একটা দস্তার পাতের কিয়দংশ ঐ এ্যাসিডের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেন, এবং পাত দুটোর মাথা বাইরে থেকে দু'টো তামার 'তার' দিয়ে যোগ করতেই দেখা গেল যে বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে সবই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এইভাবে কাচের পাত্রের মধ্যে সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড্ ঢেলে এবং তার মধ্যে তামার পাত ও দস্তার পাত চুবিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী করবার যে উপায় বের করলেন তার নাম দেওয়া হল বৈদ্যুতিক 'সেল' বা 'বিদ্যুৎ-কোষ'। এই বিদ্যুৎ কোষ সম্বন্ধে আরো ভাল ভাবে বল্‌বার আগে গোটা কয়েক কথা তোমাদের আমি বলে নিতে চাই! কথাগুলো খুব দরকারী ও জানা একান্তই প্রয়োজন!

—আমরা জানি জলের ধারার স্বাভাবিক ধর্ম্মই হচ্ছে উঁচু যায়গা হতে নীচু দিকে বহে যাওয়া!

আবার এও পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একটা বেশী গরম ও

একটা কম গরম জিনিষ যদি এক সঙ্গে রাখা যায় তবে কম গরম জিনিষটা ক্রমে ক্রমে বেশী গরম হয়ে ওঠে! এর কারণ হচ্ছে,—যে জিনিষটা বেশী গরম ছিল তার ভিতর থেকে তাপ প্রবাহ কম গরম জিনিষটার মধ্যে ছুটে গিয়ে গরম করে তোলে! ঠিক তেমনি বিদ্যুৎ প্রবাহেরও অনুরূপ ক্ষমতা আছে! Volta যে উপায়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরী করেছিলেন তাতে বিদ্যুৎ প্রবাহের যাবার পথ ছিল মাত্র একদিকে—শুধু তামা হতে দস্তার পাতে! এ্যাসিডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ দস্তার পাত হতে তামার পাতে যেতে পারে না; কিন্তু তামার পাত হতে দস্তার পাতে যেতে পারে।

বাইরের তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ যে পাত হতে অন্য পাতে যায় তার নাম 'ধন-মেরু,' Positive Pole. আর অন্যটার নাম দেওয়া হলো 'ঋণ-মেরু' Negative Pole! 'ধন-মেরু'—অর্থাৎ যে মেরু ধনী—যার কাছে সঞ্চিত বিদ্যুৎ-রূপ ধন আছে। আর যে ঋণ অর্থাৎ 'ধার' গ্রহণ করে তাকে বলে 'ঋণমেরু'। এখানে তামার পাতে বিদ্যুৎ আছে সেই জন্যে দস্তার পাত তামার পাতের কাছ হ'তে বিদ্যুৎ ধার বা ঋণ নিয়ে ঋণ মেরু বলে অভিহিত হচ্ছে। এখন তোমরা একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পার! বিদ্যুৎ তামার 'তার' দিয়ে যদি চলতেই পারে এবং তামা হতে দস্তার পাতে যেতে পারে তবে দস্তার পাত হ'তে তামার পাতেই বা যেতে পারবে না কেন? হ্যাঁ। তারও কারণ আছে। এবং

সে হচ্ছে 'তামা' ও 'দস্তার' 'তড়িৎ চালক শক্তি'র কম বেশী হওয়া—ইংরাজীতে যাকে বলা হয় Electromotive force. তামা ও দস্তাকে এ্যাসিডে ভেজালে তামার 'তড়িৎ চালক শক্তি' দস্তার তড়িৎ চালক শক্তির চেয়ে অনেক বেশী হয়ে যায় এবং সেই জন্যই তামার পাত হতে বিদ্যুৎ প্রবাহ দস্তার দিকেই যায়!

তড়িৎ চালক শক্তি আবার কী?···

চালক,—অর্থাৎ যে চালায়,—তড়িৎ-চালক শক্তি হচ্ছে যে শক্তি তড়িৎকে চালায় বা চালনা করে।···

ব্যাপারটা আরো একটু খুলে বলি শোন!···

একটু আগে বলছিলাম না, যে বেশী গরম জিনিষ হতে কম গরম জিনিষের দিকে তাপ ছুটে যায়—উচু জায়গা হতে নীচু জায়গার দিকে জল ধারা প্রবাহিত হয়; এখন বিদ্যুৎকে তামার তারের মধ্য দিয়ে চালাতে হলেও ঠিক এ ধরণের কোন একটা শক্তির দরকার;···যে শক্তি বিদ্যুৎকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। এ্যাসিডে যখন তামা ও দস্তাকে ভেজান হয় তখন এই এ্যাসিড ও ধাতু দুটি (অর্থাৎ তামা ও দস্তার) সংমিশ্রণে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া (Chemical reaction) হয়। এবং সেই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই তামার তড়িৎ চালক শক্তি দস্তার চাইতে বেশী হয়! এখন বেশী শক্তি চায় কম শক্তিকে টান্‌তে! এ অনেকটা দু'দলে মিলে দড়ি নিয়ে টাগ্-অফ্-ওয়ারের মত! যে দলের শক্তি বেশী অন্য দল তাদের কাছে হার মানে অর্থাৎ তাদের দিকে টানের জোড়ে এগিয়ে আসে; এবং এই শক্তিকেই বলা হয়

Electromotive force বা 'বিদ্যুৎচালক' শক্তি! এই Electromotive forceয়ের জন্যই তামার দিক হতে বিদ্যুৎ প্রবাহ দস্তার পাতের দিকে যায়! এখন কথা হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহ যে তারের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে তা বোঝা যায় কেমন করে?

প্রধানতঃ তিনটী কারণে তা অনায়াসেই বোঝা যায়! প্রথম হচ্ছে 'তারের' মধ্য দিয়ে যখন বিদ্যুৎ যায় তখন সেই তারটা দস্তুর মত গরম হয়ে ওঠে (Heating effect)—দ্বিতীয় রাসায়নিক ক্রিয়া (chemical effect) তৃতীয়—চুম্বক শক্তি (Magnetic effect). Voltaর তৈরী বিদ্যুৎকোষের দু'টি তারের মুখে হাত ছোঁয়াও—দেখবে তোমার হাতে গরম লাগছে।—এই ভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহের যে Heating effect তৈরী হয় সেটাকে আজকাল আমরা ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রীতে কাজে লাগাই! গরীব ধোপারা লোহার ইস্ত্রী আগুনে গরম করে তবে কাপড় জামা ইস্ত্রী করে কিন্তু এই ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রী প্লাগের সঙ্গে লাগালেই সেটা গরম হয়ে ওঠে; আমাদেরও কাজ হয়ে যায়—অনেক পরিশ্রমও কমে যায়। আজকাল অনেক সৌখিন বড় লোক ইলেক্‌ট্রিকে চায়ের জল গরম করেন। সেখানেও ঐ Heating effect'কেই কাজে লাগান হয়। আজকাল সহরের অনেক সিনেমার ঘরকে শীতকালে গরম রাখা হয় ও গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা রাখা হয়,—সেখানেও এই ইলেক্‌ট্রিক রেডিয়েটারের সাহায্যে উত্তাপ শক্তি সৃষ্টি করে কাজে লাগান

হয়। শুধু তাই নয় তোমরা হয়ত শুনে আশ্চর্য্য হবে—আজকাল ঘরে ঘরে যে আমরা সুইচ টেপা মাত্রই আলো জ্বেলে অন্ধকার দূর করে দিই—সেই আলোও এই উত্তাপ সৃষ্টি (Heating effect). তুমি একটা তারকে ক্রমাগত গরম করতে থাক—ক্রমে দেখবে সেটা লাল হয়ে উঠ্ছে। এ ত সোজা কথা—কেননা আমরা ত জানিই যে তারটা যত গরম হবে, ততই তেতে লাল হয়ে উঠ্বে। যদি আরও বেশী গরম করা যায় তবে ক্রমে তারটা সাদা হয়ে উঠ্বে—অর্থাৎ 'তার' থেকে সাদা আলো বের হবে।

Voltaর তৈরী বিদ্যুৎ কোষের বৈদ্যুতিক শক্তি বড় কম, সেজন্য ওই বিদ্যুৎ কোষে উৎপন্ন বিদ্যুৎ দিয়ে প্রায় কোন কাজই করা যেতে পারে না। Voltaর সেলের দেখা দেখি আরো অনেকে অনেক রকম 'সেল' তৈরী করেছিলেন, তাদের সব বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছিল। Voltaর তৈরী যে সব বিদ্যুৎ কোষ, সেগুলো সব এক ধরনের। এছাড়া আরও এক রকমের বিদ্যুৎ কোষ আছে যাদের Dry cell (শুষ্ক কোষ) 'ব্যাটারী' বলা হয়; যার দ্বারা তোমরা তোমাদের ইলেকট্রিক টর্চ্চ জ্বাল।

বিদ্যুতের Heating effect উত্তাপ শক্তির কথা বল্লাম এবারে এর সাহায্যে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন (chemical effect) পাওয়া যায়—তাই বল্ছি। বিদ্যুৎ-বাহি তারের দুটো মুখ যদি একটা জলের পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয় তবে দেখা

গেছে পাত্রের জল ক্রমে কমে আসছে,—কেন না দুটী বাষ্পীয় পদার্থ সেই জল হতে নির্গত হয়; একটী Hydrogen (উদ্‌জান) অন্যটী হচ্ছে অম্লজান (oxygen) গ্যাস! সেই পাত্রস্থিত জলের দিকে চাইলেই দেখা যাবে, জলে বুদ্‌বুদ্‌ উঠ্‌ছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে পাত্রস্থিত জলের মধ্যে বাষ্প তৈরী হচ্ছে।

জলকে যেমন বিদ্যুৎ দিয়ে দুই ভাগে ভাগ করা যায় তেমনি তুতের জলকেও বিদ্যুতের দ্বারা দু'ভাগে ভাগ করা যায়। তুতের জলকে—ইংরাজীতে বলে copper Sulphate Solution. অর্থাৎ তামা ও গন্ধক মিশ্রিত জল। এখন তুতের জলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ যখন যায় তখন সেটা তামা ও গন্ধকে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। বিদ্যুতের সাহায্যে এইভাবে বিশ্লেষণ করাকেই ইংরাজীতে বলে Electrolysis অর্থাৎ 'বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ'। আমরা যে সব সোনার গিল্‌ট করা সার্টের বোতাম বা রূপায় কলাই করা চক্‌-চকে ঝক্‌-ঝকে বাসন পত্র ব্যবহার করে থাকি, সেগুলো আসলে কিন্তু মূল্যবান ধাতু বা দামী জিনিষ দিয়ে তৈরী নয়। বিদ্যুতের রাসায়নিক ক্ষমতাকে এখানে ভূতের মত খাটিয়ে নেওয়া হয়। বিদ্যুৎ যতদিন মানুষের চোখ ঝল্‌সে মেঘলোকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াত, মানুষ সেই মেঘপুরীর দৈত্যকে দূর হতে পূজা করত; তারপর ক্রমে সেই দৈত্য মানুষের হাতে হল বন্দী, মানুষের বুদ্ধির যুদ্ধে পরাভব মেনে সে এসে মানুষের মুঠোর মধ্যে ধরা দিল।

ছোট বেলায় মার কাছে গল্প শুনেছিলাম, এক ব্রাহ্মণ এক দৈত্যকে তর্ক যুদ্ধে পরাস্ত করে আটক করেছিলেন। তখন সেই বন্দী দৈত্যকে দিয়ে ব্রাহ্মণ আসাধ্য সাধন করে নিয়ে ছিলেন; মানুষও তেমনি বন্দী বিদ্যুৎ-রূপী দৈত্যকে দিয়ে এমন সব বিস্ময়কর কাজ করিয়ে নিয়েছে ও নিচ্ছে যা শুনলে একেবারে অবাক হয়ে যেতে হয়। তবে ব্রাহ্মণের হাতে সে দৈত্যের একদিন মুক্তি মিলেছিলো কিন্তু মানুষের হাতে বিদ্যুৎ-দৈত্যের আজও মুক্তি মিল্‌ল না;—মানুষের হুকুম তামিল করেই সে চলেছে। জলে, স্থলে, শূন্যে, পাতালে মানুষের জন্য সে দিবারাত্র কি ছুটো ছুটিই না করছে,—কবে যে তার বিরাম হবে কে জানে? হুঃ যা বলছিলাম, বিদ্যুতের chemical effect রাসায়নিক ক্ষমতার কথা!

রূপোর কলাই করা মানে তামা কিংবা পিতলের কোন জিনিষের গায়ে রূপোর একটা আবরণ লাগিয়ে দেওয়া, যাতে সেই তামা বা পিতলের জিনিষটাকে বাইরে থেকে দেখতে অবিকল একটা চক্‌-চকে ঝক্‌-ঝকে রূপোর জিনিষের মতই দেখায়,—সেটা যে পিতল বা তামার তৈরী তা কোনমতেই বোঝা না যায়। সোনার গিল্‌ট্‌ করা মানেও তাই,—ব্যাপারটা অনেকটা যেন রূপকথার গল্পে শোনা ঘুঁটেকুড়ুনীর ছেলের গায়ে রাজার ছেলের বহুমূল্য পোষাক চাপিয়ে দেওয়ার মত—নয় কি?...

বহুকাল পূর্ব্বে পারদ (Mercury) ধাতুর সাহায্যে রূপোর কলাই বা সোনার গিল্‌ট করা হতো। তখন রূপা আর পারদকে এক সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে যে সব জিনিষকে রূপার কলাই করা

প্রয়োজন তার ওপর ঢেলে দেওয়া হতো ; তার পর সেই জিনিষটা আগুণে তাতালেই পারদটা ভাপ্ বা বাষ্প হয়ে ক্রমে উবে যেত আর জিনিষটার গায়ে তখন লেগে থাকত শুধু রূপোর একটা পাত্লা আস্তরণ ; ফলে জিনিষটা রূপোর তৈরী বলে মনে হোতো ; কেননা পারদের একটা বিশিষ্ট গুণ আছে যে, একটু গরম করলেই বাষ্প বা ভাপ্ হয়ে উবে যায়। পারদের এই ভাপ্ শরীরের পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত ও হানিকর সেই জন্য তখন লোকেরা কলাই বা গিল্ট্ করার এই প্রণালী ছেড়ে দিয়ে নূতন কোন উপায় ভাবতে সুরু করলে।

—তিন—

তারপর শেষ টায় ভেবে ভেবে ১৮০৩ খৃঃ একজন একটা নূতন উপায় বের করলেন তাঁর নাম ব্রুনাটেলী (Brugnatelli)। তিনিই প্রথম দেখালেন বিদ্যুতের সাহায্যে এই গিল্ট বা কলাই করা যেতে পারে ; কিন্তু ব্রুনাটেলী যে নূতন উপায়টী বের করলেন তাতে গিল্টের কাজ কিন্তু খুব ভাল ভাবে করা গেল না ; তখন অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরাও চেষ্টা করতে লাগলেন, এবং ১৮৪০ খৃঃ একলিংটন্ (Ekhlington) নামে একজন বৈজ্ঞানিক বিদ্যুতের সাহায্যে নূতন প্রথায় রূপোর কলাই বা সোনার গিলট

করা আবিষ্কার করলেন। তাঁর এই আবিষ্কার সমগ্র সভ্য জগতে তোলপাড় এনে দিল। এখনও পর্য্যন্ত একলিংটন আবিষ্কৃত পন্থাই এই কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাঁর আবিষ্কৃত উপায়টী হচ্ছ এই—

প্রথমে একটা কাচের বা চীনেমাটির তৈরী চৌবাচ্ছার মত চারকোণা পাত্রে একভাগ সিলভার সায়নাইড (Silver cyanide এবং দু'ভাগ পটাসিয়াম সাইনাইড (Potassium Cyanide) বেশ ভাল করে মিশিয়ে পঞ্চাশ ভাগ পরিষ্কার জলের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়। এখন সেই পাত্রের উপরে দুটো সরু তামার রড্ বা লাঠি পাশা পাশি ফাঁক করে রাখ। এখন যে জিনিষটাকে কলাই করা হবে [ধর সেটা একটা মেডেল], সেই মেডেলটাকে আগে বেশ ভাল করে এ্যাসিডে ধুয়ে নাও; তারপর সেটা আর একবার পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিয়ে—ঐ তামার রডের সঙ্গে জড়িয়ে পাত্রের মধ্যে ঝুলিয়ে দাও। এবং অন্য রডটীর সঙ্গে একটা খাদ বিহীন রূপার টুক্‌রো তামার তারে বেঁধে পাত্রের মধ্যে ঝুলিয়ে দাও। তারপর একটা শুষ্ককোষ ব্যাটারী নিয়ে এস। সেই বেটারীর ধনমেরুর সঙ্গে একটা সরু তামার তারে ঐ রূপোর টুকরটার সঙ্গে যোগ করে দাও, আর ঋণ মেরুর সঙ্গে মেডেলটা যোগ করে দাও। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে Battery থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করে ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই রাসায়নিক প্রক্রিয়া সুরু হয়। তার ফলে পাত্রের মধ্যে ঝুলান রূপার টুক্‌রা ক্রমশঃ গলে যায় ও মেডেলের গায়ে ভাল

রকমে লেগে যেতে থাকে অর্থাৎ মেডেলটা রূপোর জামা পরে। কিছুক্ষণ এই ভাবে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিয়ে ব্যাটারী খুলে নেওয়া হলে মেডেলটাকে পাত্র হতে তুলে পরিষ্কার জলে ধুয়ে ফেলা হয়। এইভাবে সকল আবশ্যকীয় জিনিষকে রূপার কলাই করা হয়।

সোনা ও রূপার মত আজ কাল Nickel plating অর্থাৎ নিকেলের কলাইও করা হয়। সোনা রূপোর কলাইও এই একই উপায়ে করা হয়। ইলেকট্রিক বা বিদ্যুতের সাহায্যে কলাই করা হয় বলে এই প্রথার নাম দেওয়া হয়েছে ইলেকট্রোপ্লেটিং; যদি রূপার কলাই করা হয় তবে তাকে বলা হয় ইলেকট্রো সিলভারিং এবং সোনার গিল্ট্ করা হলে ইলেকট্রো-গোল্‌ডিং বলে।

কিন্তু এই ভাবে সোনার গিল্ট্ বা রূপার কলাই করা জিনিষ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সব সময় ব্যবহার করলে, কিম্বা রোজ পরিষ্কার না করলে, শীঘ্রই ওপরের সোনা বা রূপোর আবরণ নষ্ট হয়ে যায়। তখন জিনিষের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। আজকালকার দিনে মানুষের যত বুদ্ধি বাড়ছে ততই তারা অন্যকে ঠকাতে শিখ্ছে। আমরা ভুলে যেতে বসেছি all that glitters is not gold. আমরা অল্পেই সন্তুষ্ট কিনা—তাই ছেলে ভুলোন সোনার জিনিষ পেয়ে একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাই। তাই আজকাল কাঁটা, চামচ, থালা, বাসন, কাপ, মেডেল, ঘড়ি, আংটি, বোতাম পিন্—কলাই করে বিক্রীও হচ্ছে সর্ব্বত্র।

এ সব ছাড়া পাড়াগাঁয়ে ও সহরে অনেক জায়গায় ঘরের ছাদ

যে টিন দিয়ে করা হয় সেও এক প্রকারের কলাই করা জিনিষ। সোনা রূপোর কলাই করা জিনিষের মত আরও দু রকমের কলাই আছে—জিঙ্ক বা দস্তার কলাই (Zinc plating)। জিঙ্ক প্লেটিংএর আর একটা নামও আছে সেটা হচ্ছে গ্যাল্‌ভানাইজিং (Galvanizing)—এই টিনের সিট্‌গুলোও Zinc plating বা Galvanizing প্রথাতেই তৈরী হয়। এ ছাড়াও আর এক প্রকারের কলাই করবার প্রণালী আছে তাকে টিনের কলাই (Tin plating) বলে।

আমরা জানি লোহা বা ইস্পাতের তৈরী জিনিষে শীঘ্র মরচে লাগে বা rust পড়ে; কিন্তু দস্তা হতে তৈরী জিনিষে মরচে লাগে না। এই জন্যই লোহার চাইতে দস্তার তৈরী জিনিষ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কিন্তু এই দস্তার তৈরী জিনিষের দাম বেশী, অথচ মজবুত কম। তখন বৈজ্ঞানিকরা ভাবতে লাগলেন, এমন একটা উপায় বের করতে হবে যাতে মরচেও না পড়ে দামও কম হয় আবার সেই সঙ্গে মজবুতও হয় যথেষ্ট—এ সেই বামুনের গরুর মত—দুধও দেবে—লাথীও মারবে না, অথচ খাবেও কম।...এবং শেষকালে একটা উপায়ও তাঁরা বের করে ফেল্লেন।

সেটা হচ্ছে এই—লোহা বা ইস্পাতের তৈরী জিনিষ যদি দস্তার কলাই করে নেওয়া যায় তবে শীঘ্র মরচেও পড়বে না, দামও কম হবে অথচ মজবুতও হবে। প্রথমে লোহা ও ইস্পাতের তৈরী জিনিষকে বেশ ভাল ভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া হ'ল—তারপর দস্তা আগুনে গলিয়ে তার মধ্যে ঐ জিনিষ

ডুবিয়ে রাখলে কিছুক্ষণ বাদে গলিত দস্তার একটা আস্তরণ বা আবরণ ইস্পাত বা লোহার জিনিষটার গায়ে পড়ে গেল। এইভাবের দস্তার কলাইয়ের প্রণালীকেই জিঙ্ক প্লেটিং Zinc plating অথবা Galvanizing বলা হয়। জিনিষগুলোও ঠিক দস্তার তৈরী জিনিষের মত মনে হয়। আজকাল জিঙ্কপ্লেটিং বা গ্যালভানাইজিং এর খুব প্রচলন হয়েছে। তাই অনেক রকম লোহা বা ইস্পাতের জিনিষেই জিঙ্ক প্লেটিং করা হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে 'ঢেউটিন'—বা করোগেটেড্ আয়রণ অর্থাৎ যে গুলোকে আমরা ঘরের ছাদে, বেড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহার করে থাকি। আসলে কিন্তু ওগুলো মোটেই টিনের প্রস্তুত নয়; প্রথমে ওগুলো লোহা দিয়ে তৈরী করে পরে জিঙ্কপ্লেটিং করা।

জিঙ্ক প্লেটিংয়ের মত Tin platingএরও কাজ আজকাল খুব প্রচলন হয়েছে। লোহা, তামা, পিতল দিয়ে তৈরী জিনিষপত্র-গুলো গলিত টিনে ডুবিয়ে রেখে দেওয়া হয় এবং কিছুক্ষণ পরে তুলে নিলে দেখতে পাওয়া যায়, ঐ সকল জিনিষের গায়ে টিনের একটা আবরণ লেগে গেছে। বাজারে আমরা সে সব কেরোসিন, পেট্রোল, তেলের ক্যানেস্ত্রা বা বিস্কুটের টিন দেখি, সবগুলোই Ting plating প্রথায় তৈরী; তবে সোনা ও রূপোর কলাইয়ের তফাৎ হচ্ছে প্রথম দুটিতে ব্যাটারী বা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, কিন্তু টিন বা দস্তার বেলা ব্যাটারী বা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না।

—চার—

Voltaর পরে বিজ্ঞান জগতে দেখা দিলেন—Humphry Davy ও Michel Faraday।…এদের ভাগ্যবান বলতে হবে—কেননা বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তখন অনেক কিছুই লোকে জেনে গেছে।…

হাম্‌ফ্রেডেভির দু'জন খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, একজনের নাম Dr. Tonkin এবং আর একজন হলেন Robert Dunkin. হাম্‌ফ্রের মতই এঁদের বিজ্ঞান চর্চ্চার দিকে ভারী ঝোঁক ছিল। Dr. Tonkinয়ের ছোট একটা ল্যাবোরেটারী ছিল—তাতে বিদ্যুৎ তৈরী করবার একটা যন্ত্র, একটা Lydenjar, ও Voltic piles প্রভৃতি কয়েকটা জিনিষ ছিল। হাম্‌ফ্রে দু'চার দিনের মধ্যেই উক্ত জিনিষগুলো নেড়ে চেড়ে ওসম্বন্ধে যা জানবার তা জেনে নিয়েছিলেন। Humphry Davyর সমস্ত কাজেই Robert, Dunkin খুব উৎসাহ দিতেন।

একদিন বাইরে খুব তুষার পড়ছে, ডেভি ডানকিনের ঘরে এসে হাজির—ডাকলেন Dun! Dun! শীঘ্র এস তোমায় একটা ম্যাজিক দেখাব!

কী ব্যাপার মাষ্টার।…

আরে এস না!

ডানকিন সেই তুষারের মধ্যেই ডেভির পিছু পিছু

চল্‌লেন। সমস্ত দুনিয়া যেন তুষারে স্নান করছে। মাঝে মাঝে কন্ কনে বাতাস গায়ের হাড় পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।... নদীর জল ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে গেছে। যেন কোন অদৃশ্য যাদুকর তার যাদু কাঠির ছোঁয়ায় নদীর উর্ম্মি মুখর জল ধারাকে নিশ্চল পাষাণে পরিণত করে রেখেছে। সহসা ডেভি নীচু হ'য়ে দু দলা তুষার হাতে তুলে নিলেন—তারপর সেই তুষারের দলা দুটো হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে চাপ দিয়ে ঘষ্‌তে লাগলেন!

ডানকিন ত' অবাক! ...

হঠাৎ হাতের মুঠোটা আল্গা করে ডেভি বল্‌লেন দেখ— দুটো দলা এক হয়ে গেছে। এমনি করেই ডেভি খেলার মধ্যে দিয়ে একদিন প্রমাণ করেছিলেন বরফ চাপে গলে যায়। এবং যেখানে চাপ লাগে সেখানেই গলে আর যেই চাপ সরে যায় অমনি সেখানে আগের মতই জমাট বেঁধে যায়। এমনি করেই একদিন সে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Gregorywattয়ের বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা তাঁকে মাত্র ২০ বৎসর বয়সের সময় Bristolয়ের এক ল্যাবোরেটারীতে গ্যাস গবেষণার কাজে এসিস্‌টেণ্ট ভাবে নিযুক্ত করে দেয়। এই সময় Davy একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু আবিষ্কার করেন;—সেটা আর কিছু নয়—একটা গ্যাস। গ্যাসটা হচ্ছে নাইট্রাস অক্সাইড্ (Nitrous oxide). যেটা 'Loughing gas' অর্থাৎ হাসির বাষ্প বলে পরিচিত। এই গ্যাস

চিকিৎসার সময় বেদনা বোধ হতে লোককে বাঁচায়। এই গ্যাস তৈয়ার সম্বন্ধে একটা গল্প আছে।

তিনি একদিন গ্যাস তৈরী করছেন এমন সময় হঠাৎ লক্ষ করলেন একজন এসিস্‌টেণ্ট কী একটা গ্যাস শোকার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল ; তাঁর ভারী কৌতুহল হলো, তিনি নিজে সেই গ্যাস শুকে পরীক্ষা করে দেখলেন এবং তিনি প্রমাণ করলেন কেমন করে এই গ্যাস কাজ করে। প্রথমতঃ মস্তিষ্কের ওপর এই গ্যাসটার ঘুম পাড়াবার একটা ক্ষমতা আছে কিন্তু একে বেশী ব্যবহার করা চলে না। ভয় হয় পাছে অজ্ঞান করতে গিয়ে লোক মরেই যায়।

আজকাল ষ্টিমার বা ট্রেনে যে সব সার্চ্চ লাইট ব্যবহার করা হয় ডেভি এই উজ্জ্বল আলোর আবিষ্কারক। তিনি একদিন দেখলেন যখন বিদ্যুৎ বিভিন্ন দুটো তারের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে তখন যদি কোন মতে দুটো তারের মুখ কাছাকাছি করা যায় তবে একটা ভীষণ উজ্জ্বল আলো প্রকাশ পায়। তখন তিনি করলেন কি দুটো তারের মাথায় দু খণ্ড কারবণ রড্ এঁটে দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিলেন, এবারে আরো উজ্জ্বল ও পরিষ্কার আলো দেখা দিল, এ থেকেই Arch lampএর সৃষ্টি হয়। ঠিক এই সময় আর একজন মণিষী ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম Michal Faraday.। বিদ্যুৎ বিজ্ঞান জগতে তাঁর নাম চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর বয়স যখন ২০ বৎসর তখন তিনি এক দপ্তরীখানায় বই বাঁধাই করবার কাজে

ঢোকেন। মাইকেলের একটা খেয়াল ছিল দোকানে যে সব বই বাঁধতে আসত সেই বইগুলো সব তন্ন তন্ন করে পড়া। এমনি যখন একদিন মাইকেল বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় একখানা বই মনোযোগ দিয়ে দেখছেন সেই সময় একজন খদ্দের দোকানে এসে প্রবেশ করল। খদ্দের ঐ যুবকটির ব্যবহারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল, বল্‌লে অত মনোযোগ দিয়ে কী দেখছো হে ছোক্‌রা? মাইকেল খদ্দেরের প্রশ্নে বড় লজ্জা পেলেন। মুখটা নীচু করে ফেল্‌লেন। কোন জবাব দিতে পারলেন না।

খদ্দেরটী তখন বল্‌লেন, তুমি যদি বিদ্যুতের কথা জানতে চাও তবে Davyর বক্তৃতা শুনো; বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবে। বলে তিনি Davyর লেকচার শোনার জন্যে শেষের চার দিনের টিকিট দিয়ে চলে গেলেন।

Davyর লেক্‌চার শুনতে হতো টিকিট কেটে। মাইকেল টিকিট পেয়ে Davyর বক্তৃতা শুনতে গেলেন। সেদিনকার সেই Davyর বক্তৃতা শুনে ফ্যারাডের মনে এক পরিবর্ত্তন এল; তিনি তক্ষুনি ঠিক করে ফেল্‌লেন বিদ্যুৎ সাধনাতেই তাঁর জীবন উৎসর্গ করবেন। তিনি চার দিনই বক্তৃতা শুনতে গেলেন। মাইকেল ফ্যারাডে চার দিন ধরে Davyর যে বক্তৃতা শুনেছিলেন সেটা গুছিয়ে ছোট করে একটা প্রবন্ধ কাগজে লিখলেন। এবং সেই প্রবন্ধ লেখা কাগজখানার সঙ্গে একটা দরখাস্ত লিখে Davyর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সেই দরখাস্তে তিনি লিখেছিলেন যে Davy যদি তাঁকে

সাহায্যকারী হিসাবে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে দেন তবে তিনি ভারী খুসী হবেন।......এক দিন দু'দিন কেটে গেল আশা ও নিরাশায় মাইকেলের বুক দুলতে থাকে,—এমন সময় এক গভীর রাত্রে দুয়ারে কড়ানাড়ার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল; মাইকেল চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে এসে দরজা খুলে দেখেন Davyর চাকর তাঁর দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে—হাতে একখানি চিঠি। আশ্চর্য্য হয়ে চাকরের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে মোম বাতীর আলোর কাছে এসে খুলে ধরতেই তাঁর চোখ দুটো আনন্দে নেচে উঠল। ডেভি তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন.—পরদিন প্রত্যুষেই অবশ্য যেন তিনি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করেন। সারারাত আর তাঁর ঘুম হলো না। আনন্দেই বাকী রাতটুকু তাঁর কেটে গেল। পরদিন ডেভির সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন এবং তাঁর সহকারী রূপে কাজে ভর্ত্তি হলেন।

দিনের পর দিন Davyর শিক্ষাধীনে থেকে এবং নিজের যত্নে ও চেষ্টায় মাইকেল জগতের মাঝে একদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। তিনি একদিন পরীক্ষা করে দেখলেন একটা বিদ্যুৎ সঞ্চারিত চুম্বকের কাছ দিয়ে যদি একটা তারকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া যায় তবে সেই তারের মধ্যেও বিদুৎ সঞ্চালিত হয়। এইরূপে তিনি ইলেক্‌ট্রো ম্যাগ্‌নেট বিদ্যুত্বাহি চুম্বক আবিষ্কার করেছিলেন।

—পাঁচ—

এরপর বিজ্ঞান জগতে দেখা দিলেন টমাস্ আল্‌ভা এডিসন। বর্ত্তমান সভ্য জগতে যে সমস্ত জিনিষ আমাদের একেবারে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ যার অভাবে আমাদের এক মুহূর্ত্তও চলে না—সেই 'ইলেকট্রিক লাইট্' 'টেলিফোন্' 'টেলিগ্রাফ' 'ইলেকট্রিক' 'রেলওয়ে' ইত্যাদি আরো কত কি ইনিই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ১৮৪৭ খৃঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী টমাস্ আমেরিকার ওহিয়ো প্রদেশের অন্তর্গত মিলান নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

এর পিতা সামুয়েল সামান্য কাঠের ব্যবসা করতেন। মা ন্যান্সীইলিয়ট বিয়ের আগে অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারীর রাজধানী ভিয়ানার এক সাধারণ স্কুলে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

দেখা যায় জগতের মাঝে দশ জনের এক জন হওয়ার মূলে থাকে তাঁদের আপন আপন মায়ের প্রভাব। সন্তানের ভবিষ্যত গড়ে ওঠার মধ্যে মায়ের হাত যে কতখানি তা ভাবলে সত্যই আশ্চর্য্য হতে হয়।

দেহের অনুপাতে এডিসনের মাথাটা ছিল অস্বাভাবিক রকমের বড়। ডাক্তারাও বলেছিলেন এবং তাঁর অভিভাবকদেরও ভয় ছিল পাছে তিনি মাথার রোগে ভোগেন। স্বাস্থ্যও তাঁর খুবই ছিল খারাপ। তাই তাঁকে অনেক বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে ভর্ত্তি

করা হয়নি। পরে যখন তাঁকে স্কুলে পাঠান হল তখন তিনি আশাতীত ফল দেখাতে পারলেন না—কাজেই সকলেই হতাশ হয়ে পড়ল ও তাঁকে স্কুল হতে ছাড়িয়ে আনা হল।

স্কুলের পরীক্ষার খাতাতেই ভাল ফল দেখাতে না পারলেই ছেলে একবারে অপদার্থ হয়, এইরূপ একটা প্রকাণ্ড ভুল ধারণা আমাদের দেশের অনেক মা বাপেরই আছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ —আজ যাঁর প্রতিভার আলোয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলোকিত ও বিস্মিত হয়ে গেছে তাঁরও স্কুলের ফল আশাপ্রদ কোন দিনই ছিল না; এমনকি তাঁর বড়দিদি স্বর্ণ কুমারী দেবী একদিন এমন কথাও বলেছিলেন, যে তাঁদের ভাই বোনদের মধ্যে ছোট ভাই রবির-ই কিছু হলো না! বিধাতা তখন বুঝি অলক্ষ্যে বসে হেসে ছিলেন; তাই পরবর্ত্তী কালে তাঁর সেই ভবিষ্যতবাণী মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে আজ রবীন্দ্র প্রতিভা সূর্য্যের আলোর মত বিকীর্ণ হয়ে উঠেছে! কিন্তু এডিসন সম্বন্ধে শিক্ষকরা যখন বলতেন 'ছেলেটার মাথায় একদম গোবর পোরা' তখন তাঁর মা কিন্তু ভারী চটে যেতেন। তাঁর মন যেন কেবলই বলত তাঁর ছেলে একদিন দশের একজন হবেই। এমন একদিন আসবে যখন সবাই তাঁর প্রতিভার পাদমূলে শ্রদ্ধাঞ্জলী দেবে। মাতৃহৃদয়ের নিভৃত কোণে পুত্রের ভবিষ্যত আশা নিয়ে যে সোনার স্বপন একদিন জেগেছিল;— পরবর্ত্তী কালে তা কেমন করে সত্যে পরিণত হয়ে জগৎবাসীকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল তা সকলেই জানে।

বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল

কৌতূহলই মানুষকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে দেয়। যুগে যুগে মানুষের এই জানবার ও বোঝবার ইচ্ছাই নব নব আবিষ্কারের পথ সুগম ও সহজ করে দিয়েছে। জানবার ও শেখবার একটা অদম্য কৌতূহল এডিসনকে শিশু বয়স হতেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। পিতাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এডিসন এত বিব্রত করে তুলতেন যে অনেক সময় তাঁকে চুপ করে থাকতে হতো।...

কল কারখানা, যন্ত্রপাতী এ সবের উপরে এডিসনের চির কালই একটা ভারী লোভ ছিল ; প্রায়ই তিনি ছোট ছোট কাঠের টুক্‌রো দিয়ে ছোট ছোট খেলার জাহাজ তৈরী করে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিতেন।

এত কৌতূহলী ছিল তাঁর মন, যে একবার একটা রাজ-হাঁসকে তিনি ডিমে তা' দিয়ে ডিম ফোটাতে দেখে তাঁর মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল জেগে ওঠে।

একদিন কোথায় তিনি পালিয়ে যান, তাঁর পিতা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে এক মাঠের মধ্যে গিয়ে দেখেন তাঁর পাগলা ছেলে গোলা ঘরের মধ্যে রাজহাঁস ও মুরগীর ডিমের উপর উবুর হয়ে বসে তা' দিয়ে সেগুলো ফোটাবার চেষ্টা করছে।

এমনি দুষ্ট ও খেয়ালীই ছিল এডিসনের স্বভাব। একবার এক খেলার সাথীর জুতো ছোট করে দিতে গিয়ে নিজের হাতের একটা আঙ্গুল কেঁটে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। একবার একটা গোলায় আগুণ ধরিয়ে দিয়ে তিনি মজা দেখেছিলেন। তাঁর মা

কিন্তু সেদিন তাঁকে বেত দিয়ে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছিলেন।......

১৮৫৪ খৃঃ এডিসন পরিবার মিলান ছেড়ে মিশিগানের অন্তর্গত পোর্ট হুরেনে এসে বাস করতে লাগলেন।

খেলা ধূলার উপর এডিসনের কোন দিন খুব বেশী একটা ঝোঁক ছিল না! প্রথম জীবনে Park য়ের লেখা একটা প্রাথমিক বিজ্ঞানের বই পড়ে তাঁর মন রসায়নের দিকে ঝোকে। তিনি সহরের নানান জায়গা হতে ছোট বড় অনেক শিশি-বোতল কুড়িয়ে এনে ঘর ভর্ত্তি করে ফেলেন। আর জল খাবারের জন্য যে পয়সা তাঁকে দেওয়া হতো তাই দিয়ে ওষুধের দোকান হতে নানা মাল মশলা কিনে এনে নিজের ঘরে বসে নাড়া চাড়া করে ওষুধগুলো পরীক্ষা করতেন।

এই ওষুধের ব্যাপারেও একবার একটা ভারী মজার ঘটনা ঘটে ছিল। একদিন তিনি খানিকটা সিডলিজ পাউডার জলে দিয়ে দেখলেন্ ভুস্ ভুস্ করে গ্যাস তৈরী হয়ে গ্লাসটা গ্যাসে ভর্ত্তি হয়ে গেল, তাই দেখে তাঁর মনে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপল ;— করলেন কি একদিন তাঁর এক সহপাঠীকে খুব খানিকটা সিডলিজ পাউডার খাইয়ে দিলেন ; তাঁর ধারণা ছিল ঐ ওষুধটা খেলে দেহের মধ্যে যে গ্যাস বা বাষ্প হবে তার সাহায্যে অনায়াসেই মানুষ হাওয়ায় ফোলা বেলুনের মত আকাশে উড়তে পারবে। তিনি ত আর জানতেন না যে সিডলিজ পাউডারটা একটা পারগেটিভ অর্থাৎ কোষ্ঠ পরিষ্কার হবার ওষুধ!

ফলে ছেলেটী যখন ওড়ার বদলে যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করতে সুরু করল তখনও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছেলেটী যে উড়তে পারছেনা সে ওষুধের দোষে না, দোষ ছেলেটীরই। সেদিনও কিন্তু তাঁকে মার কাছে যথেষ্ট মার ও বকুনী খেতে হয়েছিল।

এডিসনের বয়স যখন ১৪ বৎসর তখন পোর্টহুরেন হতে ডেনয়েট পর্য্যন্ত একটা নতুন রেলপথ খোলা হয়; এডিসন সেই রেলে চেপে দূরবর্ত্তী সহরে তাঁর নিজের হাতে রোয়া ক্ষেতের শাকশব্জী সব বে'চতে যেতেন। এই সময় ওখানে একটা ঘরোয়া যুদ্ধ বাঁধে। তখন সংবাদ পত্রের চাহিদা খুব বেশী হয়। এডিসন শাকশব্জীর দোকান তুলে দিয়ে খবরের কাগজের ব্যবসা সুরু করে দিলেন। তিনি ট্রেনের একটা ছোট কামরায় ছোটখাটো একটা ল্যাবোরেটারী তৈরী করে নিয়েছিলেন, এবং অবসর সময় সেখানে বসে বসে নানা রকম পরীক্ষা করতেন। একদিন ট্রেনখানা রাস্তা খারাপ থাকায় হঠাৎ একটা ভীষণ ঝাঁকুনী দিয়ে ওঠে। ফলে খানিকটা ফস্‌ফরাস স্থানচ্যুত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট আওয়াজ হয়ে সমস্ত কামরায় আগুণ জ্বালিয়ে দেয়। অনেক চেষ্টায়ও আগুণ নেভান গেল না। এদিকে ড্রাইভার আগুণ দেখে গাড়ী থামিয়ে ছুটে এসে জল ঢেলে আগুণ নিভিয়ে এডিসনকে কান ধরে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে তাঁর জিনিষপত্র সব লণ্ডভণ্ড করে ান মেরে ফেলে দিলে। সেদিনকার সেই কান মলা এতো জোরে হয়েছিল যে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি সে কানটাতে কিছু শুনতে পেতেন না।

এর কিছুদিন পরে রেলের এক কর্ম্মচারী তাঁর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাঁকে টেলিগ্রাফের কাজ শেখাতে রাজী হলেন। তিনি টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করতে করতে Duplex System বা একই তারে একই সময়ে দুই দিক হতে সংবাদ প্রেরণের প্রণালী আবিষ্কার করলেন; কিন্তু সেদিন অতটুকু একটা ছেলের কথা কেউই শুনতে চাইল না—সকলে হেসেই উড়িয়ে দিল। তেইশ বৎসর বয়েসের সময় তিনি এলেন নিউইয়র্কে। এই সময় তিনি এক কারখানায় আশ্রয় নিয়ে থাকতেন। একদিন সেই কারখানার কলটা হঠাৎ বিগড়ে যাওয়ায় তিনি সতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কলটা সারিয়ে দিলেন। সেইখানে মাসিক তিন শত ডলারের একটা চাকরী পেয়ে এডিসন উন্নতির প্রথম সোপানে বসলেন। এবং প্রচুর অর্থ ও অবকাশ পেয়ে তিনি মন খুলে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞান চর্চ্চায় নিয়োজিত করলেন।

—ছয়—

আজ আমরা ঘরে ঘরে সুইচ টিপে যে আলো জ্বালাই সেই ইলেকট্রিক আলো হাম্‌ফ্রো ডেভিই সর্ব্বপ্রথম ১৮১২ খৃঃ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি প্রথমে একটা ব্যাটারী তৈরী করেন। ইলেকট্রিক ব্যাটারী কেমন করে হয় নিশ্চয়ই মনে আছে! কেননা সেকথা একটু আগে তোমাদের বলেছি।

ডেভি করলেন কি ঐ শক্তিশালী ব্যাটারী তৈরী করে তামার 'তার' দুটো ব্যাটারীর সাথে যোগ করে দিলেন। ডেভি ইতিপূর্ব্বেই পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে একটা ব্যাটারীর সাথে সংযুক্ত বিদুৎবাহী দু'টী তারের মুখ যদি কাছা কাছি আনা যায় তবে একটা উজ্জ্বল আলো (Spark) দেখা দেয়। এবং সেই বিদ্যুৎবাহী দু'টী তারের মুখে দুটো সরু 'কার্ব্বন্ রড্' এঁটে দিয়ে যদি পরস্পরের সঙ্গে একবার ছুঁইয়েই তক্ষুনি আবার পৃথক করে নেওয়া যায় তবে একটা সুন্দর উজ্জ্বল আলোর শিখা পাওয়া যায়।

আমরা জানি কার্ব্বন্ একটা রাসায়নিক পদার্থ এবং ওটা কয়লার মতই শক্ত। কিন্তু ডেভি ভাবতে লাগলেন—এই আলোর উৎস কোথা হতে আসে ? শেষে লক্ষ্য করলেন, কারবনের মধ্য দিয়ে এইভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে গেলে কারবণটা ক্রমশঃ গরম হয় ও পরে বাষ্পে পরিণত হয়। আবার এই বাষ্পই কারবনের রড্ দুটীর মধ্যস্থিত ফাঁককে পূর্ণ করে দেয় এবং তারই ফলে উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি হয়। এই ভাবে আবিষ্কৃত আলোই Arch lamp নামে পরিচিত এবং এই Arch lampয়ের সাহায্যেই Steamer, Cenema প্রভৃতিতে সার্চ্চ লাইটের কাজ চালান হ'য়ে থাকে।

হামফ্রে ডেভি Arch lamp আবিষ্কার করলেন বটে কিন্তু এই Arch lamp ত আর বাড়ীর আলোর কাজে ব্যবহার করা যায় না ! হামফ্রের পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ এই সম্বন্ধে গবেষণা
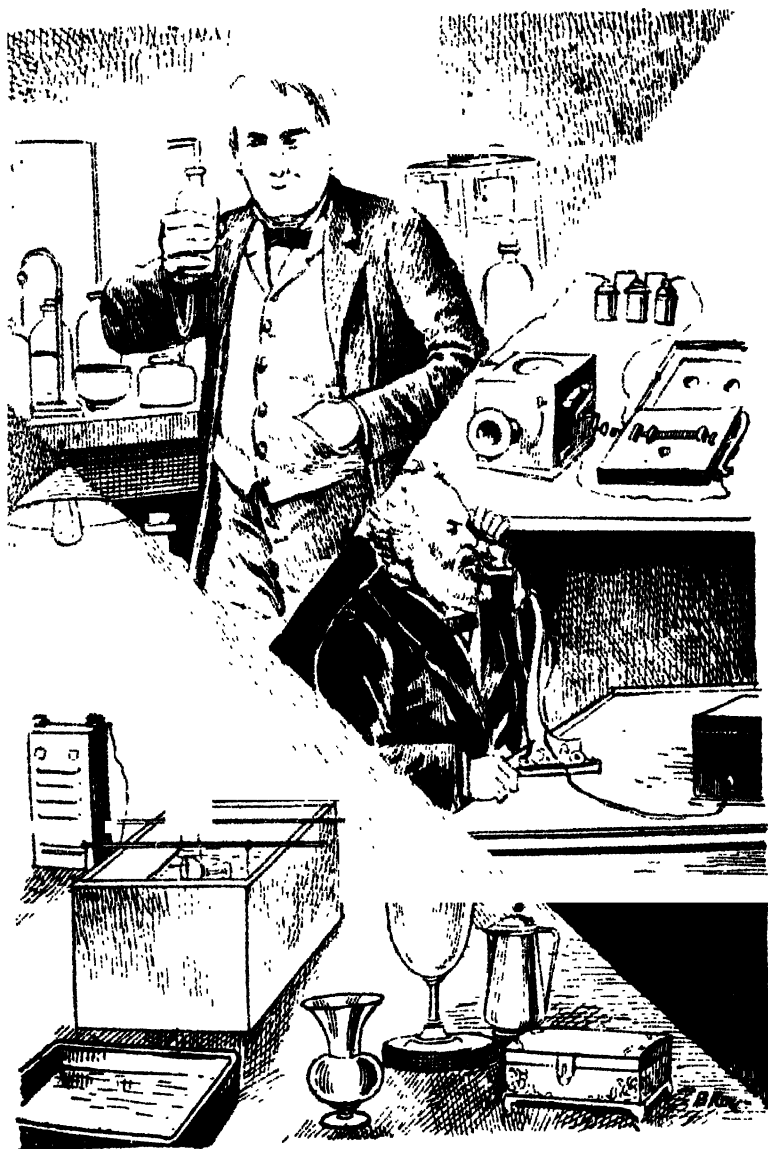
'টেলিগ্রাফ' Duplex System ও আধুনিক বৈদ্যুতিক

সুরু করে দিলেন। এবং তাঁরা পরীক্ষা করে দেখ্‌লেন—যে খুব সরু তারের মধ্য দিয়ে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে দেওয়া যায় তবে সেটা ক্রমশঃ গরম হয়ে ওঠে—এ কথাটা অবশ্য আগেও তোমাদের বলেছি। তাঁরা আরো দেখ্‌লেন লোহা বা ইস্পাতের 'তার' খুব শীঘ্র গরম হয় ও জ্বলতে জ্বলতে শেষে ক্রমশঃ গলে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এও দেখলেন প্ল্যাটিনাম, লোহা বা ইস্পাত থেকে মূল্যবান ধাতু যদি ব্যবহার করা যায় তবে সেটা আরো বেশী জ্বলে। এখন কথা হলো, যে বস্তু বেশী জ্বলবে তার থেকেই বেশী উজ্জ্বল আলো পাওয়া যাবে। এই সময় আমাদের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন ইলেট্রিক বাতি আবিষ্কার করলেন। তিনি একটা কাচের বালব্‌ (bulb) তৈরী করে তার মধ্যে একটা প্ল্যাটিনামের সরু তারের কুণ্ডলী পুরে দিয়ে সেই তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে দিলেন—ফলে সুন্দর পরিষ্কার উজ্জ্বল আলো পাওয়া গেল। একথা তোমাদের আগেই বলেছি যে প্ল্যাটিনামের তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে গেলে অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে জ্বলে ও আলো বিকীর্ণ করে।

এ ছাড়াও প্ল্যাটিনাম তারের আরো কতকগুলো গুণ দেখা গেল; প্রথম হচ্ছে প্ল্যাটিনাম হতে খুব সরু তার তৈরী করা যায়। দ্বিতীয়ত প্লাটিনাম খুব বেশী উত্তাপেও গলে যায় না!—এই সব কারণেই প্ল্যাটিনাম ধাতু খুব বেশী মূল্যবান হলেও এটাকেই ইলেকট্রিক বাল্‌বের জন্য ব্যবহার করা হতে লাগল!

এইভাবে ইলেকট্রিক বাল্‌বেরও স্থষ্টি হলো! বালবের মধ্যে যে সরু তারের কুণ্ডলী দেখা যায় তাদের বলা হয় ফিলামেণ্ট (Filament). এডিসন্ লক্ষ করলেন যে প্ল্যাটিনাম ফিলামেণ্টের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ গেলে সেটা জ্বলতে থাকে এবং যথেষ্ট আলোও পাওয়া যায় কিন্তু বাল্‌বের মধ্যস্থিত ঠাণ্ডা হাওয়ার দরুণ ফিলামেণ্টের উত্তাপ শীঘ্রই কমে আসে। উত্তাপ কমার সঙ্গে সঙ্গে bulbয়ের আলোর তেজও ক্রমশঃ কমে আসে; এই অসুবিধা দূর করবার জন্য তিনি আর এক উপায় ভেবে ভেবে বের করলেন; সে উপায় হচ্ছে—যদি কোন রকমে bulbয়ের মধ্যস্থিত ঠাণ্ডা হাওয়া বের করে নেওয়া যায়, যাতে করে উত্তাপ কমবে না! যেমন ভাবা তেমন কাজ। এডিসন পাম্পের সাহায্যে বাল্‌বের হাওয়া বের করে নিলেন এবং তাতে করে আলোর তেজ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আর থাকল না।

কিন্তু প্ল্যাটিনামের এত গুণ থাকা সত্ত্বেও একটা অসুবিধা ছিল; প্ল্যাটিনাম খুব বেশী ডিগ্রীর উত্তাপ সহ্য করতে পারে না; সেইজন্য ভুল ক্রমে যদি একটু বেশী শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রবাহ তার মধ্য দিয়ে চলে যায় তবে প্ল্যাটিনাম একেবারে গলে যায় এবং ফলে bulbটা হয়ে যায় একেবারে অকেজো! বৈজ্ঞানিক এডিসন্ চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লেন! তখন তিনি ভাবলেন এমন কোন ফিলামেণ্ট বের করতে হবে যাতে করে গলে যাবার ভয় আর না থাকে!

ভেবে ভেবে ১৮৭৯ খৃঃ তিনি কারবনের ফিলামেণ্ট তৈরী

করলেন। তোমরা বোধ হয় জাননা যে বাঁশের মধ্যে কার্‌বন আছে! এডিসন্ এই বাঁশ হতে খুব সরু সরু সুতোর মত আঁশ নিয়ে বেঁকিয়ে ফিলামেণ্ট তৈরী করলেন; এবং সেই ফিলামেণ্টকে খুব বেশী ডিগ্রী গরম করলেন; তাতে সেইগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল এবং কারবণ ফিলামেণ্টে পরিণত হল! এই ভাবে ফিলামেণ্ট তৈরী করে কাচের bulbএ ভরে তার ছু' মুখ প্ল্যাটিনাম 'তারে' জুড়ে দিলেন; এই প্ল্যাটিনাম 'তার' ছুটো একটী সরু কাচের নলের মধ্যে দিয়ে টানিয়ে দিয়ে সেটা একবারে বাল্‌বের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন

তারপর বাল্‌বের মধ্যস্থিত বাতাস পাম্পের সাহায্যে বের করে নেওয়া হল। কেননা তা না হলে বাতাসের মধ্যকার অক্সিজেন গ্যাস জ্বলন্ত কারবনের ফিলামেণ্টের সংস্পর্শে আসবা-মাত্রই কারবন ডায়ক্সাইড গ্যাস তৈরী হবে এবং তার ফলে ক্রমশঃ কারবণ ফিলামেণ্ট একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে! তা ছাড়াও বাতাসে ফিলামেণ্ট ঠাণ্ডা হয়ে উত্তাপ কমে যাবার সম্ভাবনাও ছিল!

এই ভাবে প্রস্তুত আলো বহুদিন পর্য্যন্ত মানুষ ব্যবহার করল, কিন্তু এরও একটা দোষ দেখা গেল! কারবণের খুব সুক্ষ্ম ফিলামেণ্ট ব্যবহার করলেও তাতে খুব উজ্জ্বল আলো পাওয়া যেত না, আর ১৩০০ ডিগ্রী উত্তাপে এই কারবণ ফিলামেণ্ট গলে যায় বলে বেশী শক্তিশালী বিদ্যুৎও ব্যবহার করা যেত না! সেই জন্য কারবণ হতেও বেশী উত্তাপ সহ্য করতে পারে এমন কিছুর সন্ধানে বৈজ্ঞানিকের মন সন্ধিৎসু হয়ে উঠ্‌ল।

এডিসন যখন এই ভাবে ইলেকট্রিক বাল্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন তখন জার্ম্মানীতে ওয়েলস্‌ব্যাক wellsback নামে এক বৈজ্ঞানিক গ্যাসের আলোর ম্যাণ্টল (Mantle) বা বার্ত্তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করছিলেন ! তিনি নানা দুষ্প্রাপ্য ধাতু নিয়ে পরীক্ষা করে ১৮৯৮ খৃঃ অস্‌মিয়াম (osminm) ধাতু দিয়ে ফিলামেণ্ট তৈরী করে এক বাল্ব জ্বালালেন। এই অস্‌মিয়ম ধাতু ২২০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ সহ্য করতে পারে, কিন্তু এর দাম অত্যন্ত বেশী। মাত্র আধ সেরের দাম ১০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ১৭৫০ টাকা। এই অস্‌মিয়ম নির্ম্মিত ফিলামেণ্ট দিয়ে তৈরী বাল্ব ভাল আলোও দিত অথচ কম বিদ্যুৎও লাগত !

১৯০৩ খৃঃ জার্ম্মানীতে আর এক প্রকারের নূতন ফিলামেণ্ট আবিষ্কৃত হল, এর নাম ট্যাণ্টিলাম। ট্যাণ্টিলাম ধাতু দিয়েই এটা তৈরী। প্রায় ৩০০০ ডিগ্রী উত্তাপ সহ্য করতে পারে; তা ছাড়া এই ধাতু দিয়ে খুব সরু তারও তৈরী করা যায়। কিন্তু কারবণ ফিলামেণ্টের চাইতে Tantalum ধাতুর ফিলামেণ্ট অনেক বড় না হলে বেশী আলো পাওয়া যায় না; আবার বেশী বড় ফিলামেণ্ট হলে ছোট কাচের বাল্‌বের মধ্যে ঢোকান যায় না ! একটা সুবিধা হইত অন্য অসুবিধা দেখা দেয় !

এরপর Tungsten ধাতু নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে আমেরিকার আর এক জন বৈজ্ঞানিক নূতন ফিলামেণ্ট তৈরী করলেন।

এই ভাবে দীর্ঘ ৭০ বৎসরের বহু বৈজ্ঞানিকের বহু গবেষনার

ফলে ট্যাংষ্টেন নির্ম্মিত ফিলামেণ্টের বালব্ তৈরী করা হল। আমরা আজ কাল ঘরে ঘরে যে সব বাল্‌ব ব্যবহার করছি সে সবই ট্যাঙ্‌ষ্টেন নির্ম্মিত। এই ইলেকট্রিক বাল্‌ব তৈরী হবার পর তিনি দেখলেন বাল্‌বটা প্রথম প্রথম বেশ কিছুদিন জ্বলে ও আলোও পাওয়া যায় কিন্তু ক্রমে অতি সুক্ষ্ম ধাতুর অংশ বা গুঁড়া ঝড়ে পড়ে কাচের বাল্‌বের ভিতরকার গায়ের চারদিকে লেগে যায়, ফলে বাল্‌বটা ক্রমশঃ ময়লা হয়ে আলোর তেজ কমিয়ে দেয়।

বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখলেন বাল্‌বের ভিতর হতে বাতাস বের করে নিয়ে সেটা একেবারে শূন্য না রেখে তার মধ্যে যদি নাইট্রোজেন গ্যাস ভরে দেওয়া যায় তবে বাল্‌বের সুক্ষ্ম গুঁড়োর জন্য ময়লা হয়ে যাবার সম্ভবনা আর থাকে না—কেননা নাইট্রোজেন একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং সেই জন্যই অক্সিজেন বা অন্য কোন গ্যাস যদি এর সংস্পর্শে আসে তবে কোন রাসায়নিক মিলন হয় না। সেই কারণে ফিলামেণ্ট যত গরম হতে থাকে তার মধ্যস্থিত নাইট্রোজেন গ্যাসও গরম হতে থাকে। এখন গ্যাসের একটা গুণ হচ্ছে সেটা যত গরম হয় তত উপরের দিকে উঠ্‌তে থাকে, তার ফলে ফিলামেণ্টের ঝরে পড়া গুঁড়াগুলো অত্যন্ত হাল্কা বলে সেই গরম গ্যাসের সঙ্গে উপরে উঠে বাল্‌বের মাথায় গিয়ে জমা হয়ে থাকে, তাতে বাল্‌বও আর ময়লা হয় না এবং উজ্জ্বল আলোও পাওয়া যায়।

আজকাল নাইট্রোজেনের বদলে Argon নামে অন্য একটী গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে—এটী নাইট্রোজেন হতে অনেক বেশী

ফলপ্রদ। স্যার উইলিয়াম র‍্যামাজ William Ramsay এটী আবিষ্কার করেন!

এইত' গেল ইলেকট্রিক বাল্‌ব ও তার আবিষ্কারের কথা!

—সাত—

তোমাদের বলেছিলাম, মনে আছে হয়ত যে, বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়িয়ে বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘ হতে বিদ্যুৎ এনে লিডেনজার ভর্ত্তি করেছিলেন,—এখন তিনি যে বিদ্যুৎ এনেছিলেন সে বিদ্যুৎ কোথায় ছিল? একটু চিন্তা করে দেখলেই তা বোঝা যায়। বিদ্যুৎ ছিল মেঘের মধ্যে অর্থাৎ এক কথায় আকাশের মেঘই হচ্ছে বিদ্যুতের বাহন! বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন, আকাশে বেশী উঁচুতে যে সকল মেঘ ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যে ধনাত্মক (Positive) বিদ্যুতের ভাগই বেশী আর যে মেঘগুলি অপেক্ষাকৃত নীচে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যে ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুতের ভাগটাই বেশী। এখন এই বিপরীত ধর্ম্মী বিদ্যুৎবাহী দুখণ্ড মেঘ যেই কাছাকাছি হয়, অমনি আগুণের স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়; এই আগুণের স্ফুলিঙ্গকেই আমরা বিদ্যুৎ চমকান বলে থাকি—তারপর এই বিদ্যুৎ চমকানর সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিরাট শব্দও হয়, সেই শব্দকেই আমরা বলি বজ্র। কিন্তু একটা জিনিষ

লক্ষ্য করে দেখো—আগে বিদুৎ চম্‌কান দেখি—তারপর বজ্রের শব্দ শুনি—এর কারণ কি ? একই সময়ে ত' স্ফুলিঙ্গও দেখা দিল শব্দও হোল তবে একটা আগে দেখি এবং অন্যটা পরে শুনি কেন ? এর কারণ খুব সোজা ! আলোর গতি (velocity) অত্যন্ত দ্রুত। সেকেণ্ডে সে চলে ১৮৬,০০০ মাইল। আর শব্দের গতি বেগ (velocity) হচ্ছে সেকেণ্ডে ১,১০০ ফিট মাত্র ! এই জন্য আকাশে দুটো মেঘের সংস্পর্শে স্ফূলিঙ্গ ও বজ্রের শব্দ যখন হয় তখন শব্দ তরঙ্গ আমাদের কানে পৌঁছবার অনেক আগেই আলোর তরঙ্গ আমাদের চোখে এসে ধাক্কা দেয়। যদি বিদ্যুৎ স্ফূরণের পাঁচ সেকেণ্ড পরে আমরা শব্দ শুনতে পাই তবে বুঝতে হবে ঐ বিদ্যুৎ স্ফুরণ প্রায় এক মাইল উপরে হয়েছে। বায়ুমণ্ডলের বৈদ্যুতিক শক্তিকে পৃথিবীর ওপর অবস্থিত পদার্থ বেশ সহজেই আকর্ষণ করতে পারে। যখন মেঘলা দিনে আকাশ ভরে মেঘের খেলা চলতে থাকে, ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ে, মাঝে মাঝে জলো হাওয়া ঘরের পর্দাগুলো দুলিয়ে দিয়ে যায় তখন দেখা যায় দূরে বহুদূরে কোন মাঠের মাঝে গাছের আগায় বজ্রপাতে আগুণ জ্বলে ওঠে, এর কারণ কী ?...যখন কোন ধনাত্মক বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘ ঋণাত্মক সুউচ্চ গাছের মাথার কাছ দিয়ে যায় তখন এই চলমান ধনাত্মক বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘকে ঋণাত্মক নিজের কাছে টেনে আনে—ফলে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতের মিলনে আগুণ জ্বলে ওঠে, গাছটাও পুড়ে জ্বলে যায় ! আমরা বলি গাছটা বজ্রাঘাতে পুড়ে গেল ! বিশেষতঃ খোলা মাঠের

মধ্যে অথবা অনেকগুলি গাছের মধ্যে যদি একটা বেশী উঁচু গাছ থাকে তবে বজ্রের আঘাত ঐ গাছটার উপর নিশ্চয়ই পড়বে। এই জন্যই আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে দেখা যায় প্রায়ই উঁচু তালগাছে বজ্রপাত হয়।

তোমরা ছোট বেলায় ভূগোলে মেরু প্রদেশের যে আলোর কথা পড়েছ—যাকে ইংরাজীতে অরোরা বেরিয়ালিস বলা হয়—সেও এই বিমানচারী বিদ্যুতেরই কারসাজী।

মেরুর কাছাকাছি দেশ গুলিতে আকাশে রংবেরঙের বিরাট বৈদ্যুতিক আলো দেখা যায়! বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছেন—সূর্য্য থেকে বিদ্যুৎ কণা বেরিয়ে মেরুর উপরকার আকাশে হাল্‌কা বাতাসের ওপর পড়ে এবং আশ্চর্য্য আলোর সৃষ্টি করে!

কলকাতায় চিত্রা, মেট্রো সিনেমা প্রভৃতিতে যে লাল ও নীল আলোর ডিউবে চিত্রা ও মেট্রো লেখা দেখা যায় ওর নাম নিয়ন চিহ্ন। 'Neon sign' ওটা বিশেষ কিছুই না; কাচের নলের মধ্যে দিয়ে বাষ্প ভরে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে দেওয়া হয়, এবং তার ফলে নলের ভিতরে অবস্থিত অল্প চাপ বিশিষ্ট গ্যাস্ বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে আলোর সৃষ্টি করে! আলোর লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন রং গ্যাসের উপর নির্ভর করে! যেমন পারদ বাষ্প হতে নীল, হিলিয়াম হতে পিঙ্গল এবং কার্ব্বণডায়ক্সাইড গ্যাস হতে দিনের আলোর মত সাদা আলো পাওয়া যায়। বায়ু মণ্ডলে যত ওপরে ওঠা যায়, বায়ুর

চাপ তত কম হতে থাকে। প্রায় ৫০ মাইল উপরে বায়ুর চাপ অত্যন্ত অল্প! এই অল্প চাপ বিশিষ্ট বায়ু মণ্ডলে ভিন্নধর্ম্মী বিদ্যুৎ তরঙ্গ একে অন্যের কাছে আসে এবং সেই কাছে আসার দরুণ চমৎকার আলোক মালার উদ্ভব হয়! কিন্তু শব্দ তেমন হয় না। আলোক মালাকেই অরোরা বেরিয়ালিস্ বলা হয়।

বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বলতে গেলে শেষ হবে না। সে যে কত রহস্যময় ও কত আশ্চর্য্য তা না পড়লে জানা যায় না! তোমরা যখন বড় হয়ে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে পড়বে তখন দেখবে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রহস্য ঐ বিদ্যুতের মাঝে লুকিয়ে আছে!

—আট—

আলো; আলো। সেই আদিম যুগ হতে আজ পর্য্যন্ত মানুষ কত সাধনাই না করেছে এই আলোর জন্যে! এই আলো--যার জন্যে আমরা ধরণীর বিশাল সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হই! মাথার উপরের ঐ গাঢ় নীল আকাশ—যেখানে নিত্য চলে মেঘের খেলা; গাছের সবুজ পাতা—ফল, ফুল, পশু, পাখী, কিছুই আমরা দেখতে পেতাম না যদি না আলো থাকত! আলো না থাকলে আমরা কোন কাজই করতে পারতাম না; গৃহকোনে নিশ্চেষ্ট হয়ে চুপটী করে বসে জীবন কাটিয়ে দিতে হত! সুতরাং কি জীবন সংগ্রামে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগে আমাদের দু'টি চোখের মতই আলোও একান্ত প্রয়োজনীয়!

বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল

সে অনেক দিন আগেকার কথা বলছি! সভ্যতার আলো তখনও এমনি করে বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল স্বষ্টি করে এই পৃথিবীর মানুষকে পাগল করে তোলেনি। মানুষ তখন নিতান্ত পশু ও বর্ব্বর ; উলঙ্গ, অর্দ্ধ উলঙ্গ হ'য়ে বনের পশুর মতই আপন আপন স্বার্থ নিয়ে হাতাহাতি করে মরত। দিনের বেলা যতক্ষণ সূর্য্যের আলো থাকতো মানুষ বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত, কিন্তু যেই আঁধার ঘনিয়ে আসতো সব গিয়ে গুহায় ঢুকতো। তখনও 'আলো' এমনি করে রাতের আঁধারকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি! আলোর কথা হয়ত পৃথিবীর কেউ তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।...তার পর সেই আদিম অসভ্য মানুষের দল আবিষ্কার করলে পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি করলে আগুন জ্বলে, এবং সেই আগুণের আভায় অন্ধকার দূরে সরে যায়। ক্রমে যত দিন যেতে লাগল মানুষ সভ্যতার স্পর্শে সজীব হ'য়ে উঠতে লাগল! গুহা অরণ্য ছেড়ে ক্রমে তারা লোকালয় স্বষ্টি করে সেখানে বাস করতে লাগল! ক্রমে তারা মৌচাক হতে মোম সংগ্রহ করে তাই দিয়ে বাতি তৈরী করলে এবং রাতের আঁধারে সেই মোম বাতি দিয়ে আলো জ্বালাতে লাগল।...তার পর তারা একদিন মাটির নিচে যে তেল আছে এটা জানতে পারে এবং সেই তেল দিয়ে বাতি জ্বালাতে স্বরু করে দেয়; তার পর আবিষ্কৃত হলো কারবাইড্ ও ম্যান্টেল এবং ক্রমান্বয়ে তারা ইলেকট্রিক বাতি আবিষ্কার করে সম্পুর্ণভাবে আঁধারকে একেবারে পরাজিত করলে।

আসল আলো ও তার কার্য্যকারি ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করতে

গেলে আমরা দেখি—কতকগুলো বস্তু জ্যোতি দেয় এবং তাদের বলে জ্যোতিষ্মান বস্তু। জ্যোতিষ্মান বস্তুর মধ্যে যেমন, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, প্রদীপ, বৈদ্যুতিক বাতি ইত্যাদি! আর জ্যোতিহীন বস্তু সকল—যেমন টেবিল-চেয়ার, ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা প্রভৃতি সব কিছুই!

এখন যে সকল বস্তু জ্যোতিহীন তাদের আমরা দেখবো কি করে? না—কোন বাইরের আলোর সাহায্যে আলোকিত করে সেগুলিকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করাতে হ'বে।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। একদিন দুপুর বেলা বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা অদ্ভুত খেয়াল এল; তিনি করলেন কি—ঘরের মধ্যে ঢুকে তাঁর সমস্ত জানালা দরজা এঁটে ঘরটাকে অন্ধকার করে দিলেন, তারপর জানালার কবাটের গায়ে একটা ফুটো করে দিলেন; অন্ধকার ঘরের মধ্যে জানালার ফুটো দিয়ে একটা আলোর রশ্মি এসে উঁকি দিল; তখন তিনি একটা কাচের প্রিজম্ নিয়ে সেই আলোর রশ্মির গায়ে ধরে দেখতে লাগলেন কী হয়? কাচের প্রিজ্‌ম্ কী?, একটা সমচতুষ্কোন পুরু কাচ। তিনি দেখলেন সূর্য্যের শাদা আলোর রশ্মিটা কাচের প্রিজিমের ভিতর দিয়ে ভেদ করে বেরিয়ে আসবার পর নানা রংয়ে ভেঙ্গে গেছে এবং সেই রংটা ঠিক একেবারে আকাশে যেমন রামধনু ওঠে ঠিক তেমনিই দেখাচ্ছে! বৈজ্ঞানিকের সেদিনকার সামান্য এই একটি খেয়াল সমগ্র বিজ্ঞান জগতে

তোল পাড় এনে দিল ! তিনি এই অজ্ঞাত বস্তুর নাম দিলেন spectrum বা বর্ণচ্ছটা।

ঐ বর্ণচ্ছটা আর কিছুই নয়, কেবল শাদা আলোর রশ্মি ভেঙ্গে গিয়ে ঐরূপ বিভিন্ন রংএর সৃষ্টি হয়। কোন একটা বর্ণচ্ছটাকে পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যায় তার ভিতরে লাল, সবুজ, বেগুনী, কমলালেবু প্রভৃতি সাতটি বিভিন্ন রং আছে। এও পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সূর্য্যের ভিতরেও ঐ সাতটি রং যখন একত্রে মিশে যায় তখন তাহা শাদা হয়ে যায় ! বৈজ্ঞানিকেরা কাচের প্রিজমের ভিতর দিয়ে আলোর বর্ণচ্ছটা দেখেই জানতে পেরেছিলেন সূর্য্যের আলোয় সাত রকম রং আছে !

বৃষ্টির পরে রোদ উঠলে আকাশে যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বৃহৎ বর্ণচ্ছটা দেখা যায়—যাকে তোমরা রামধনু বলে জান, সেটা আর কিছুই নয়—সূর্য্যের আলোর বর্ণচ্ছটা বা Spectrum. এটা কেমন করে সৃষ্টি হয় জান ? আকাশের অসংখ্য বৃষ্টির জল কণাগুলি এক একটা নিউটনের কাচের প্রিজমের মত কাজ করে। সূর্য্যের শাদা আলোর রশ্মি তার মধ্য দিয়ে ভেদ করে যখন গিয়ে আকাশের গায়ে প্রতিফলিত হয় তখন সেই শাদা আলো সাত রংয়ে বিভক্ত হয়ে 'বর্ণচ্ছটা Spectrum তৈরী করে ! এবং তাকেই তোমরা বল আকাশে রামধনু উঠেছে।

আর একবারও ঠিক এমনি এক ব্যাপার ঘটেছিল—নিউটন যখন কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তখন সেখানে দুরন্ত প্লেগ দেখা দিয়েছে ; দলে দলে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে ;

নিউটন এই দেখে দেশে চলে এলেন ! হাতে বিশেষ তেমন কোন কাজ কর্ম্ম ছিল না ; একদিন দুপুরে বাগানের মধ্যে গাছের নীচে একটা বেঞ্চির ওপর বসে বসে কী সব আপন মনে ভাবছেন ! সহসা অদূরে টুপ্ করে গাছ হতে একটা ফল এসে মাটীতে পড়ল ! নিউটনের মাথায়ও এই দেখে অদ্ভুত এক খেয়াল জেগে উঠ্ল !—ফল কেন মাটীতে পড়ে ? কী অদ্ভুত চিন্তা দেখ ! ফল পেকে মাটীতে পড়বে না'ত কী গাছেই ঝুলতে থাকবে ? কিন্তু নিউটন অত সহজে ভোলবার ছেলে নন। তিনি ভাবতে ভাবতে এক নতুন জিনিষ আবিষ্কার করলেন ! সেটা কি ? না—ফল যে গাছ হতে মাটিতে পরে—সেটা মাটির টানে ; এবং তার নাম দিলেন মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) !

—নয়—

ছাতের উপর পাটী পেতে আমি দাদামণি ও আমার ছোট বোন কমলী বসে বসে গল্প করছিলাম। কালো আকাশের বুকে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটা তারা পিট্ পিট্ করে জ্বলছিল। সহসা এক সময় দাদামণি আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন !

—ওই দূরে আকাশের গায়ে তারাগুলো দেখছো সন্তু ! খুব বেশীদিনকার কথা নয় ; মানুষের ধারণা ছিল আকাশের ঐ তারাগুলো বুঝি অনাদি অতীত হতে অমনি করেই বোবা মেয়ের

মত এই মাটীর পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে। তুমি আমি যেমন একদিন এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলাম এবং একদিন না একদিন যেমন আমাদের সকলকেই মরতে হবে,—ঠিক তেমনি ওই তারাগুলোও একদিন আমাদের মতই আকাশের বুকে জন্ম নিয়েছে এবং তারাও একদিন মরণ পথের যাত্রী হবে !

আমাদের দত্ত কবি শ্রীমধুসূদনের সেই কবিতাটী মনে পড়ে—

"জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা ক'বে ?
চিরস্থির নহে নীর হায়রে জীবন নদে।"

বৈজ্ঞানিকরা কি বলেন জান ? সুদূর অতীতে এমন একদিন ছিল যখন এই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকা, পৃথিবী কোন কিছুই তাদের নিজ নিজ আকার পায়নি। সকলে এক পদার্থ এবং একই অবস্থায় ছিল। এবং সেই পদার্থের নাম হচ্ছে 'নীহারিকা'। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় Nebula.

আমি প্রশ্ন করলাম--দাদা এই নীহারিকা কি ?

—নীহারিকা আর কিছুই নয়, কেবল পুঞ্জীভূত বাষ্পীয় মেঘ। এই বাষ্পীয় মেঘের আলো বিকিরণ করবার ক্ষমতা আছে। এখনও সহস্র সহস্র নীহারিকা আকাশে বর্ত্তমান রয়েছে। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া নীহারিকা দেখা যায় না।

বৈজ্ঞানিকদের মতে একদিন নাকি সমগ্র চরাচরই ছিল শুধু কুয়াসায় বা বাষ্পীয় মেঘে ঢাকা। জ্যোতির্ব্বিদদের মতে এই নীহারিকাদের মধ্যে কতকগুলো আকৃতি বিহীন, আবার কতক-

গুলো কুণ্ডলাকৃতি (Spiral); এই কুণ্ডলাকৃতি নীহারিকাগুলো আবার গতিশীল এবং তারা এক একটা কেন্দ্র বিন্দুর চারদিকে অহরহ আবর্ত্তন করছে ত করছেই! সেই আবর্ত্তনের সময় এই নীহারিকা বা বাষ্পীয় মেঘস্থিত বাষ্পীয় কণাগুলো পরস্পরের আকর্ষণের ফলে স্থানে স্থানে নীহারিকা দেহ ঘনীভুত হয়ে কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই ভাবে ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যস্থিত উত্তাপও বেড়ে উঠ্ছে, আর সেই উত্তাপ হতেই ক্রমে সেটা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়; এই উজ্জ্বল বস্তুটাই হচ্ছে আকাশের তারকা! তবেই দেখা যাচ্ছে নীহারিকা হতেই তারকা জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু এই নীহারিকা কোথা হতে আসে? আর এমন ত' একদিন আসতে পারে ক্রমান্বয়ে এইভাবে অনন্ত কাল ধরে যদি নীহারিকার মধ্যে নিত্য নূতন নূতন 'তারা' এমনি করে তৈরী হতে থাকে—তবে ভবিষ্যতে একদিন সমস্ত নীহারিকাই হয় ত' শেষ হয়ে যাবে! তখন নূতন 'তারা' কোথা হতে জন্ম নেবে?

বৈজ্ঞানিকরা বল্লেন—মা ভৈঃ, ভয়ের কিছু নেই! আসলে ঠিক তা হয় না,—আকাশের বুকে নিত্য নূতন 'তারা' যেমন জন্ম নেয়, তেমনি নূতন নীহারিকাও নিত্য সৃষ্ট হচ্ছে!

যে 'তারা' একদিন আকাশের বুকে জ্বল জ্বল করে জ্বলে, সেও একদিন নিষ্প্রভ হয়ে আসবে; তার সমস্ত আলো শেষ হয়ে শেষের দিনটি ঘনিয়ে আসবে সবার মতই!

মানুষ যেমন মরবার পর আবার ফিরে জন্ম নেয়—ঐ জ্যোতিহীন তারাও একদিন তেমনি নূতন জন্ম নিতে পারে!

কেমন করে?

এখন হয় কি ঐ মৃত জ্যোতিহীন 'তারা' শূন্য পথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন যদি কোন ক্রমে আর একটা উজ্জ্বল তারার সামনে পড়ে যায় তখন দু'জনে হয় ভীষণ এক ঠোকাঠুকি এবং ঐ ঠোকাঠুকির ফলে এত বেশী উত্তাপ সৃষ্টি হয় যে সেই উত্তাপে দুটো তারাই নিমেষে গলে গিয়ে বাষ্প হয়ে যায়; তখন আবার সেই নূতন তৈরী বাষ্প নিজের চারদিকে আবর্ত্তন করতে আরম্ভ করে; ফলে হয় কুণ্ডলাকৃতি (Spiral) নীহারিকা বা বাষ্পের জন্ম! তুমি ত' জানই কুণ্ডলাকৃতি নীহারিকা বা বাষ্প হতে কেমন করে তারার জন্ম হয়! এছাড়াও আরও এক ভাবে সম্ভব হয়। দুটো তারার ঘর্ষণের ফলে তাপ এত বেশী সৃষ্টি হয় ও তাদের মধ্যে আকর্ষণ এত বেশী বেড়ে যায় যে, দুটো তারাই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। তারপর এই অগণিত টুক্‌রোগুলো একটা কেন্দ্রীয় টুক্‌রোর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে একটা কুণ্ডালাকৃতি নীহারিকার সৃষ্টি করে! সময় সময় দেখা যায়—আকাশের একটা জায়গা যেটা বরাবরই ফাঁক ছিল, সহসা একদিন সেই শূন্য স্থানে দেখা দিয়েছে একটা নূতন জ্বলজ্বলে তারা। এবং কিছুদিন ধরে তারাটা বেশ উজ্জ্বল ভাবেই দীপ্তি দেয়—তারপর একদিন আর দেখা যায় না। জ্যোতির্ব্বিদরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ
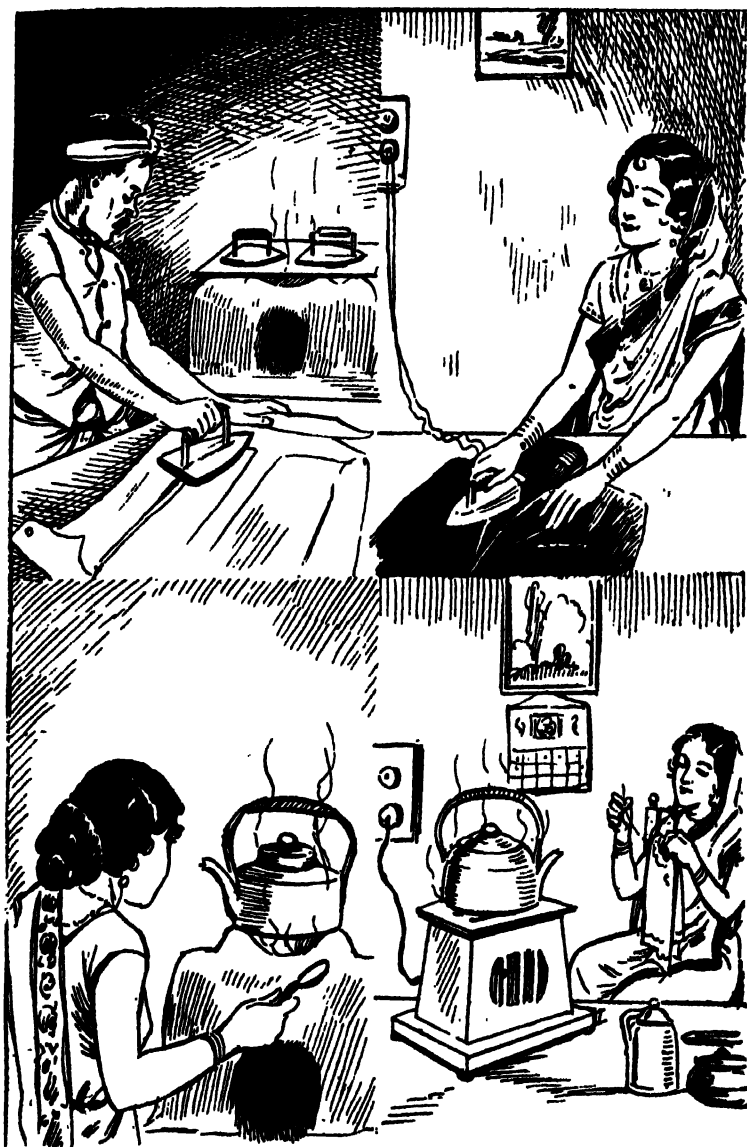
আধুনিক যুগে বিদ্যুৎকে ভৃত্যের মত খাটিয়ে নিয়ে ঘরে ঘরে মানুষ কেমন করে তার গৃহস্থালীর কাজ করছে ; যেমন, ইস্ত্রি. চায়ের জল গরম, রন্ধন প্রভৃতি।

স্থানটাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সেই নূতন তারকার চারদিকে ঘিরে আছে একটা নূতন নীহারিকা! এমনি অনেক-গুলো নূতন নক্ষত্র গত শতাব্দীতে আকাশে উদিত হয়েছে! বৈজ্ঞানিকদের মতে সূর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্রগ্রহ, তারকা সব কিছুই নাকি ঐ নীহারিকা হতেই একদিন সৃষ্টি হয়েছিল!

এমন সময় সহসা আকাশের গায়ে একটা 'তারা' ছুটে গেল; আমি চীৎকার করে বল্লাম—ঐ দেখ দাদামণি, একটা 'তারা' খসে পড়লো!...

আমার কথাশুনে দাদামণি হেসে ফেল্‌ল! ওরে পাগল, জানিস সত্যিকারের এক একটা 'তারা' আকারে কত বড়! কোন কোনটা সূর্য্যের চেয়ে হাজার গুণ বড়, আবার কোন কোনটা হয়ত অনেক ছোট! কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে অনেক বেশী দূরে আছে বলে আমাদের চোখে ওরা এত ছোট বলে মনে হয়। ওদের উত্তাপ এত বেশী যে ধারণা করা যায় না! আসলে সূর্য্য ও তারার মধ্যে বিশেষ কিছুই প্রভেদ নেই; শুধু তারা সূর্য্যের চাইতে অনেক বড় ও পৃথিবী সূর্য্যের অনেক দূরে অবস্থিত। তাহলেই বুঝে দেখ্ সত্যি সত্যি যদি একটা তারা শূন্য হতে পৃথিবীতে ছুটে আসত—তবে এই পৃথিবীর অস্তিত্ব এক মুহূর্ত্তেই লোপ পেয়ে যেত! কাজেই আমরা চলতি কথায় যাকে 'তারা ছোটা' বা ইংরাজীতে shooting starবলি আসলে সেটা মোটেই কিন্তু তা নয়!

তবে ওটা কী দাদামণি?

ধূমকেতুর নাম নিশ্চয়ই শুনেছো? ধূমকেতু হচ্ছে উজ্জ্বল বাষ্পে গঠিত ঝাটার মত ল্যাজ বিশিষ্ট, আকাশ পথে ভ্রমণকারী একটা আশ্চর্য্য জিনিষ। ধূমকেতুর ল্যাজ লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত।

সূর্য্যের চারপাশে যেমন গ্রহ উপগ্রহগুলো দিবারাত্র ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তেমনি অনেক ধূমকেতুও সূর্য্যের চারদিকে ভ্রমণ করে বেড়ায়। তবে তাদের ভ্রমণ পথ এত বিস্তৃত যে, একটা ধূমকেতু অনেক বছর পর পর সূর্য্যের কাছে আসে ; এবং যখন ঘুরতে ঘুরতে সূর্য্যের কাছে আসে—তখনিই আমরা তাকে চোখে দেখতে পাই ; অন্য সময় তাদের টিকিটাও দেখা যায় না। আবার কাছে আসলেও অনেক ধূমকেতু এতদূরে থাকে যে দূরবীক্ষণের সাহায্য ছাড়া খালি চোখে দেখা একেবারে অসম্ভব! কতকগুলো ধূমকেতু আছে যারা অনেক দূর থেকে আসে—আর সূর্য্যকে একবার মাত্র বেষ্টন করে সেই যে চলে যায়—আর কোন কালেও তাদের দেখা পাওয়া যায় না। ধূমকেতু দেখতে উজ্জ্বল তারার মতই মনে হয় ; তবে দু' একটা পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়ে বলে বেশ বড় আলোকপিণ্ডের মতই দেখা যায়! (Haley's) হেলির ধূমকেতুর কথা হয়ত তোমরা অনেকেই শুনেছো। ১৬৪০ খৃঃ উহা প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসর ভ্রমণের পর ঐ ধূমকেতু এক এক বার পৃথিবীর কাছে আসে, এবং তখন ওকে দেখা যায়! তাহলে হিসেব করে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮৫ খৃঃ আগে

আর ঐ ধূমকেতু দেখবার কোন উপায় নেই! সেই সময় পর্য্যন্ত তোমরা যদি কেউ বেঁচে থাক তবে ঐ ধূমকেতু দেখতে পাবে। আগেই বলেছি এদের ঝাঁটার মত একটা ল্যাজ আছে, সেটার বিশেষত্ব এই যে, পিছন দিকে কিছুদূর পর্য্যন্ত একটা স্পষ্ট চওড়া আলোর মত দেখা যায়। এটাকে ধূমকেতুর পুচ্ছ বলে। পণ্ডিতরা বলেন এই ধূমকেতুর পুচ্ছ আসলে অসংখ্য ছোট ছোট পাথর বা ধাতব পদার্থের সমষ্টি। আমরা জানি পৃথিবীও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের মত সূর্য্যের চারপাশে ঘুরছে ; কখনও এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী যদি কোন ধূমকেতুর পুচ্ছের কাছ দিয়ে চলে যায় তবে ঐ পুচ্ছের ভিতরে যে সব পাথরের খণ্ড আছে তাদের কতকগুলোকে পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকর্ষণ করে অর্থাৎ কাছে টানতে থাকে—এবং এই কাছে টানবার দরুণ সেই পুচ্ছের পাথরখণ্ডগুলো পথ ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশঃ পৃথিবীর দিকে আসতে আরম্ভ করে। এইভাবে আকর্ষিত পাথর খণ্ডেরই দু' একটা আমাদের চোখে পড়ে যায়—আর আমরা তাকেই তারা ছুটছে বা shooting star বলে ভুল করি! কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই যে, সেগুলো 'তারা' বলে আমরা ভুল করি কেন? পৃথিবীর উপরে অবস্থিত বায়ুমণ্ডলের কথা তোমাদের সেদিন আলট্রাভায়োলেটের সম্বন্ধে বলতে বলতে বলেছিলাম মনে আছে ত'?

হাঁ মনে আছে।

বেশ এখন হয় কি—যখন ঐ পাথরখণ্ডগুলো পৃথিবীর আকর্ষণে বায়ুমণ্ডলে এসে প্রবেশ করে তখন ওদের মধ্যে এত প্রচণ্ড বেগ থাকে যে বাতাসের সঙ্গে প্রবল ঘর্ষণের ফলে দপ করে জ্বলে ওঠে; এই জ্বলে ওঠা অবস্থায়ই আমরা ওই পাথর-খণ্ডগুলোকে দূর হতে 'আঁধারে তারা' বলে ভুল করি। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো পুরাকালে পৃথিবীর আদিম মানব সন্তানরা পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাত! ঘষার জন্য পাথর দুটো গরম হয়ে আগুণ জ্বলে ওঠে। পুচ্ছের ঐ পাথর খণ্ডগুলোও যখন বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে নামে তখন তাদের গতি এত দ্রুত হয় যে, ঐ গতি অনায়াসেই সমস্ত পৃথিবীকে আধ-ঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসতে পারে; কাজেই অত জোরে যখন বাতাসের মধ্য দিয়ে নামে তখন বাতাসের সংস্পর্শে আগুণ জ্বলে ওঠা খুবই স্বাভাবিক নয় কি?...

এই জ্বলন্ত পাথরগুলোর নাম হচ্ছে উল্কা বা Meteor, যাকে আমরা সাধারণত 'তারা ছোটা' বা Shooting star বলি! এই পাথরখণ্ডগুলো কোন সময় ধূলিকণার মত ছোট হয়ে পড়ে আবার কোন সময়ে ছোট বড় নানা রকম হয়ে থাকে। আমাদের নেহাৎ ভাগ্য বলতে হবে যে, এই উল্কাগুলো সচরাচর লোকালয়ে এসে পড়ে না। বেশীরভাগ সময়ই সমুদ্রে পড়ে ডুবে যায়। তবে স্থলে যে একবারেই পড়ে না তাও নয়। ১৯০৮ খৃঃ সাইবেরিয়াতে এত বড় একটা উল্কা পড়েছিল যে, কোন সহরে পড়লে সে সহরের আর চিহ্নমাত্রও হয়ত পাওয়া যেত না!

খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে একবার একটা উল্কা পড়ায় চীন দেশে প্রায় দশ জন লোক মারা গিয়েছিল। অনেক উল্কা বিভিন্ন দেশের যাদুঘরে রাখা হয়েছে। ১৭৮৩ খৃঃ আর্জ্জেন্টিনার 'গ্রান চাকো' মরুভূমিতে একটা লৌহময় উল্কা পাওয়া গিয়েছিল, তার ওজন ষোল সতের মণ! এর চাইতেও বড় একটা উল্কা পাওয়া যায় ১৮৫৪ খৃঃ অষ্ট্রেলিয়াতে মেলবোর্ণের কাছে ক্রানবোর্ড সহরে। এই দুটী লৌহখণ্ডই লণ্ডনের যাদুঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে। উল্কার মধ্যে অনেক রকম ধাতু ও অন্যান্য জিনিষ পাওয়া গেছে। ধাতুর মধ্যে বেশীর ভাগই লোহা ও নিকেল। অষ্ট্রেলিয়াতে একটা উল্কা পড়েছিল—তার মধ্যে অনেক জিনিষ পাওয়া গিয়েছিল—সোনা, তামা, গন্ধক, এলুমিনিয়াম ও প্ল্যাটিনাম। এমন কি ছোট ছোট হীরার টুক্‌রা পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল। ভেবে দেখ এরকম একটা উল্কা যদি আমাদের বাড়ীতে এসে পড়ে তবে বেশ মজা হয়—না? রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাওয়া যায়। কী বল?

একটা কথা তোমাদের এই সঙ্গে বলে নিই! এই যে রাস্তা, হাটে, পথে, ঘাটে সর্ব্বত্র রাশি রাশি ধূলো পড়ে আছে দেখতে পাই,—যার জন্য আমরা নিত্য বিরক্ত হই,—জামা কাপড় সব নষ্ট ময়লা হয়ে যায়,—নাকে চোখে মুখে ঢুকে নানা ব্যাধির সৃষ্টি করে, এই বিশ্রী ধুলো সব কোথা হতে এল জান?

এই ধূলি সৃষ্টির মূলেও অনেকগুলি কারণ আছে—তার মধ্যে একটী হচ্ছে উল্কার পর উল্কা মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবীর দিকে

ছুটে আসছে এ আমরা জানি, এবং তাদের মধ্যে সুবৃহৎ উল্কা বছরে ছ' চার দশটা মাত্র পৃথিবীর বুকে এসে পড়লেও অধিকাংশই পৃথিবীর উপরে অবস্থিত বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবা-মাত্রই বাতাসের সাথে ঘষাঘষি খেয়ে জ্বলে উঠে ধূলিকণায় পরিণত হয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছে! স্যার নরম্যান লক্ইয়ারের মতে প্রতিদিন নাকি প্রায় চল্লিশ কোটি উল্কা বায়ুমণ্ডলে মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীতে এসে প্রবেশ করে; যদিও তাদের গড় পড়তা ওজন এক গ্রামের (Gram) শতাংশের একাংশও হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার পর উল্কা যে ধূলিকণায় পরিণত হয় তাতে প্রতিদিন এক লক্ষ গ্রাম (Gram)পরিমাণ ধূলি বেড়ে যাচ্ছে; অর্থাৎ এই ভাবে যদি ধূলি জমা হতে থাকে তবে তার দ্বারা চারকোটি বছরে সমগ্র পৃথিবীতে এক মিলিমিটার পুরু অর্থাৎ এক আধুলীর পরিমাণ ধূলিস্তর তৈরী হতে পারে! কিন্তু এই উল্কা ছাড়াও আরও অন্যান্য উপায়ে পৃথিবীর বুকে ধূলিকণা জমা হতে পারে। আগ্নেয়গিরি সমূহ হতে যে ধূলিকণা উৎক্ষিপ্ত হয়, তাও দুই দিন আগে বা পরে পৃথিবীর বুকেই এসে পড়ে জমা হয়।

এ ছাড়া বৃষ্টি ধারার সঙ্গেও অসংখ্য ধূলিকণা পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে। আমের মিষ্টি শাঁস টুকু যেমন তার বিচিটাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে—তেমনি আকাশের বৃষ্টির ফোঁটাও কোন কিছুকে কেন্দ্র করেই সাধারণত গড়ে ওঠে। এছাড়াও বায়ুমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত বিবিধ পদার্থের কণা বৃষ্টি ধারার

সাথে সাথে পৃথিবীর বুকে ধূলিরূপে এসে জড়ো হয়! এই ধূলি বাতাসের বেগে ইতঃস্তত বয়ে গিয়ে প্রবল বর্ষনের ফলে দালান, কোঠা বাড়ী সব ক্ষয় করে ধূলির পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই যে বিপুল পরিমাণ ধূলি নানা ভাবে উৎপন্ন হয়ে জমা হচ্ছে এর সবটাই যদি থেকে যেত—তবে হয়ত একদিন আমাদের জীবন দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠ্‌ত,—ধূলির চাপে হয়ত আমরা সকলে একদিন বিলুপ্তই হয়ে যেতাম; কিন্তু এই বিশ্বের সমস্ত নিয়ম-কানন এত সুনিয়ন্ত্রিত, এত সুশৃঙ্খল যে ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়। কেমন করে যে এই উৎপন্ন বিশাল ধূলির একটা বিরাট অংশ সকলের দৃষ্টির অগোচরে অপসারিত হয়ে যায় সেই কথাই বলছি শোন।

বৃষ্টির ধারা যেমন নদীরূপে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে মিশে —সাগর ও নদীর জল উত্তাপে বাষ্প হয়ে আকাশে গিয়ে মেঘের সৃষ্টি করে—এবং সেই মেঘ আবার জল হয়ে পৃথিবীর বুকে অঝোর ধারায় ঝরে পড়ে, তেমনি ঠিক এই পৃথিবীতে উৎপন্ন ধূলি-কণারও একটা বিরাট অংশ জলস্রোতের মাঝে বাহিত হয়ে নিত্য সাগরের জলে গিয়ে পড়ছে, এবং সাগরে পড়বার পর সাগরের লোনাজলের স্পর্শে জমাট বেঁধে আস্তে আস্তে যেমন 'ব-দ্বীপ' বা স্থল ভাগের সৃষ্টি করছে তেমনি আবার স্থলভাগ ভেঙ্গে গিয়ে তা থেকে ধূলির উৎপত্তি হচ্ছে। এই ভাবেই অতীতের অনেক দেশ যেমন ভেঙ্গে জলস্রোতের সাথে মিশে গেছে, তেমনি আবার বহুকালের সঞ্চিত ধূলিই হয়ত জমে জমে বর্ত্তমানের অনেক

দেশ বিদেশের ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পন্ন করেছে। এছাড়া বায়ু প্রবাহের সাথে সাথেও ধূলিকণার অপসরণ ঘটে !

এই নগন্য ধূলি-কণা যে এই জগতে কত ভাবে কত কাজ করছে তা ভাবলেও আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয় !

এই ধূলিকণার সহায়তা না পেলে বৃষ্টিধারা কখনও পৃথিবীকে সিক্ত করতে বা ভিজাতে পারত না ! বায়ুমণ্ডলে যদি ধূলিকণা না থাকত তবে বাতাস আগুণের মত উত্তপ্ত হয়ে পৃথিবীকে পুড়িয়ে একেবারে ছারখার করে দিত ! বৃষ্টি না হ'লে উদ্ভিদাদি জন্মাতে পারে না—আর উদ্ভিদ যদি না জন্মায় তবে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার মূল উপকরণ কয়লার জন্ম হতো না। বৃষ্টির জন্য ধূলির প্রয়োজন। কেননা বাতাসে ধূলো চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বৃষ্টি কনাকে আশ্রয় জুগিয়েই বেশী পরিমাণে বৃষ্টির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। মৌসুমী অঞ্চলে ও গ্রীষ্মমণ্ডলে আমরা জানি বেশী বৃষ্টি হয়। ধূলিকণাকে আশ্রয় বা কেন্দ্র করেই যদি বৃষ্টির জল-ধারা সঞ্চিত হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে—বৃষ্টি প্রধান বিষুব-রেখা অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলেই বেশী ধূলি বাতাসে জড়ো হয়ে থাকে। প্রত্যহ সকাল সাঁঝে আকাশে যে বিচিত্র রংয়ের খেলা আমরা দেখতে পাই তার মূলেও ওই ধূলি-কণাই আছে। সূর্য্যের আলো বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত ধূলিকণার দ্বারা প্রতিফলিত হয়েই আকাশ পথে না না রংয়ের খেলার সৃষ্টি করে ; এবং তা যদি না হতো তবে সমস্ত আকাশ জুড়ে দেখা যেত একটা বৈচিত্র হীন বিরাট কালো পর্দ্দা ! সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের অমন যে নয়নাভিরাম

দৃশ্য তা হয় ত চির কালই আমাদের অজানাই থেকে যেত। এ সব ছাড়া ধূলিকণার অপকারের কথাও আমরা ভুলতে পারি না! এরা দিবা রাত্র আমাদের নাকে চোখে মুখে ঢুকে বিরক্ত করে; এই ধূলি হতেই Silicosis প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি ঘটায়! আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে নানা বিষাক্ত রোগ জন্মায়! এই সব কারণেই আধুনিক বিজ্ঞান এই ধূলি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য জোর গবেষণা চালাচ্ছে নানা ভাবে।......

—দশ—

সেদিন বেড়াতে গিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল! নদীর ধার ঘেঁষে মেটে আঁকাবাঁকা সরু পথ! একপাশে খাড়া নীচু পাড়—অন্য পাশে বুনো গাছ গাছড়ার জঙ্গল। গাছের পাতায় পাতায় জোনাকী পোকা তাদের আলো জ্বাল্‌ছে আর নিভুচ্ছে। দাদামণি আগে আগে চলছেন,—পিছনে কমলি ও গজু। হঠাৎ একসময় দাদামণি বল্‌লো কমলি, গজু—তোমরা কবিতায় পড়েছো,

জোনাকীর বাতি শোভে তরুশাখা পরে—

শুধু জোনাকী কেন, আরও নানা প্রকারের কীট, পতঙ্গ, মৎস্য প্রভৃতি তাদের শরীর হতে আলো দান করতে পারে। জন্তুর গা হতে এই আলোর উদ্ভব বলেই এ আলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'জান্তব আলো' অর্থাৎ সজীব আলো (Animal light)!

ডাঃ নিউটন হার্ভে বলেন অন্ততঃ ছত্রিশ রকম প্রাণীর দেহ হ'তে আলো বিচ্ছুরিত হয়! তিনি আলোকে দুইভাগে ভাগ করেছেন :—খুব বেশী উত্তাপের জন্য দেহ হতে যে আলো বিকীর্ণ হয়, তাকে বলেছেন 'তাপজ্জল আলো'। আর উত্তাপ ছাড়া অন্য কারণে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় তাকে বলেছেন 'শীতল আলো'।

'জান্তব আলো অর্থাৎ প্রাণীর গা হতে উদ্ভূত আলো' প্রাণির দেহ মধ্যস্থিত কোষের (cell) ভিতর হতে উৎপন্ন নির্য্যাস বা রস হতেই সৃষ্টি হয়! এই জান্তব আলোর বর্ণচ্ছটার মধ্যে ইন্‌ফ্রারেড্ বা আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মি থাকে না। এই ধরণের সজীব আলো সাধারণ আলোর মতই ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর কাজ করে।

জীবের কোষের মধ্যে যে দীপ্তিশীল বস্তুটীর সৃষ্টি হয়, সেখান হতেই আলো বিকীর্ণ হতে পারে, অথবা প্রাণীর দেহ হতে একটা ভাস্বর রস বা স্রাব নিঃসৃত হয়ে প্রাণীটা চলে গেলে সমুদ্র বা জমীর উপর একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যেতে পারে। এই আলোর উৎপত্তি ও স্থায়ীত্ব খুবই অল্পক্ষণ! তবে নিরবিচ্ছিন্ন হওয়াও অসম্ভব না! কতকগুলো মাছ আছে যারা তাদের সতত ক্রিয়াশীল ভাস্বর অঙ্গগুলো ইচ্ছা মত একটা সুক্ষ্ম পর্দ্দা দিয়ে ঢেকে দিতে পারে।

ভাস্বর স্রাব বা রস প্রায়ই অমিশ্র মাংস গ্রন্থি (Gland) হতে নিঃসৃত হয়। ঐ গ্রন্থিগুলো প্রাণীর দেহের মধ্যে ইতঃস্তত ছড়ানো বা একই স্থানে সন্নিবিষ্ট ভাবে সাজান থাকে! অধ্যাপক হার্ভে বলেন এই মাংস গ্রন্থিগুলো দেখতে নাকি অবিকল

চোখের মত। এই সমস্ত আলো-দান-কারী কোষশ্রেণীর সামনের দিকে একটা, কখনও বা তিনটে কাচের লেন্সের মত বস্তু থাকে; তাদের পশ্চাতে একটা প্রতিফলক (Reflector) থাকাও খুব বেশী বিচিত্র নয়। এর পশ্চাতে একটা কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদনও আছে, এবং এই কোষগুলো উত্তেজিত করবার জন্য স্নায়ুমণ্ডলীও আছে। Raphael Dubois—বিখ্যাত ফরাসী প্রাণীতত্ত্ব বিদ্ ১৮৮৭ খৃঃ একটা ভারী সুন্দর তথ্য আবিষ্কার করেন! তিনি গরম ও ঠাণ্ডা জলে পৃথক ভাবে একরকম দ্বিখোল ঝিনুক ফোলাসের (Pholas) দীপক মাংসতন্তুর নির্য্যাস তৈরী করে কিছুক্ষণ রেখে দিলেন; ক্রমশঃ যখন সেই দীপক মাংসতন্তুর আলো দানের ক্ষমতা চলে গেল, তখন সেই ঠাণ্ডা ও গরম নির্য্যাসকে একসাথে মিশান মাত্রই আবার আলো দেখা গেল; এই থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন গরম জলের নির্য্যাসে যে লুসিফেরিন্ নামক পদার্থ আছে, সেটা উত্তাপে নষ্ট হয় না; এই পদার্থটী লুসিফারেস্ নামক কিণ্বের (ferment) সহযোগে অক্সিজেন যুক্ত হবার সময় আলোর সৃষ্টি করে!

অধ্যাপক হার্ভে বলেন লুসিফেরিন্ ও লুসিফারেস্ উভয় পদার্থ একত্রে ঠাণ্ডা জলের নির্য্যাসে অবিকৃত থাকে। আর লুসিফেরিন্ ও লুসিফারেস একসঙ্গে মেশালেই আলো দেখা দেয়, কিন্তু লুসিফারেস্ একবার অক্সিজেন দ্বারা জরিত (fer-mented) হলে আর আলোর সৃষ্টি হয় না!

দীপক গোবরে পোকা, দ্বিখোল ঝিনুক, ফোলাস, ও সমুদ্রের

ছোট ছোট কাঁকড়া, চিংড়ী, সাইপ্রিডিনা প্রভৃতি নানা জীবদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাদের গর্ভস্থিত লুসিফেরিন ও লুসিফারেস্ নামক দুইটী সতন্ত্র বস্তু জল ও অক্সিজেন বাষ্পের উপস্থিতে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায় এবং তার ফলে আলোর উদ্ভব হয়।

কমলি জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা দাদামণি এই লুসিফারেসটা কী? দাদা উত্তর দিল লুসিফারেসটা হচ্ছে এক প্রকার অন্নসার (Protein) ডিমের সাদা অংশের মতই একপ্রকার জিনিষ।

এই রকম তাপ হীন সজীব আলো দেবার শক্তি সাধারণতঃ সামুদ্রিক জীবদের মধ্যেই খুব বেশী দেখা যায়। ভূমধ্য সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের যাত্রীরা অনেক সময় এই সকল জন্তুর দেহ নিঃস্থত জান্তব আলোকে সমস্ত সমুদ্র পর্য্যন্ত আলোকময় দেখতে পায়। আধুনিক গবেষনার দ্বারা জানা গেছে, অনেক জন্তুর অঙ্গ বিশেষের গঠন এমনই যে, এর থেকে নির্গত আলোকে সার্চ্চ লাইটের মত এদিক ওদিক ঘোরাতে পর্য্যন্ত পারে এবং এই আলোর দ্বারাই তারা আত্মরক্ষা, শিকার ধরা প্রভৃতি কাজ প্রয়োজন ও ইচ্ছা মত করতে পারে। কোন কোন জন্তুর দেহের আলো এতই তীব্র যে অনেক অসভ্য দেশের অধিবাসীরা তাদের কতকগুলো জন্তু একত্রিত করে গভীর বনে অন্ধকারের মধ্যে চলবার সময় লণ্ঠনের মত ব্যবহার করে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপের স্ত্রীলোকেরা লাল, নীল, সবুজপ্রভৃতি আলো দিতে পারে এমনি সব ছোট ছোট জন্তুকে অলঙ্কার রূপে ব্যবহার পর্য্যন্ত করে থাকে। সভ্য জগতেও যে

এরকম আলো একেবারে চলেনা তাও না। ভীষণ বিস্ফোরকের মধ্যে যেখানে সামান্য একটু উত্তাপেও যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা থাকে সেখানে এইরূপ আলো ব্যবহার করা হয়েছে। জেলেরা অনেক সময় রাত্রে নৌকোয় দাঁড় হতে বিন্দু বিন্দু স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়তে দেখে এবং ঢেউয়ের গায়ে আলোর প্রভা জ্বলে উঠতে দেখে ; তার কারণ হচ্ছে জলের মধ্যে অবস্থিত ছত্রাক উদ্ভিদের জন্য ও বীজাণুর জন্য আলোর উদ্ভব হয়ে থাকে। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের বটানীর অধ্যাপক ডাক্তার সহায়রাম বসু মহাশয় আমাদের দেশের ভাস্বর ছত্রাক নিয়ে বহু গবেষণা করছেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁর লিখিত বহু তথ্য-পূর্ণ প্রবন্ধও আছে ! বড় হলে পড়ে দেখো !

হাঁ—ভাল কথা সজীব আলোর কথা বলবার সময় আলেয়া জিনিষটা কী, বলতে ভুল হয়ে গেছে ? ওটাও একপ্রকার গ্যাসের জন্য আলো হয়—তাকে মার্স গ্যাস বলে। সাধারণতঃ গাছপালা পচে ঐ গ্যাস জন্মায়, সেই জন্যই সাধারণতঃ জলা ভূমিতে আঁধার রাতে আমরা আলেয়া দেখি !

—এগার—

দুই বন্ধু মনু আর মণ্টুতে তর্ক বেধেছে রেডিয়াম নিয়ে।

মণ্টু বলে, রেডিয়ামটা আর কিছুই নয় ; ওটা একটা আলো, মনু বল্‌লে, তোর কি বুদ্ধি ! আলো ! আলো জ্বালাতে ফিতে

লাগে জানিস ? তেল লাগে ! আরো কত কি ! মণ্টু জবাব দিল, ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌য়ে ফিতে আছে দেখিস্‌ না ? যেমন তোর গাধার মত কাণ তেমনি তোর গাধার মত বুদ্ধি ! রেডিয়ামটা একটা অদৃশ্য জ্যোতি ! কিন্তু মনু ওর কথা মানতে রাজী নয় ! মণ্টু বল্‌লে, বেশ তবে চল দাদার কাছে যাই ! তা'হলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মিহির বাবু, মণ্টুর দাদা একজন বৈজ্ঞানিক। দু'জনে মিমাংসার জন্য তার কাছে গেল ! দাদা হাসতে হাসতে বল্‌লেন, তোমাদের দুজনের কথাই ঠিক !...কিন্তু তার মধ্যেও কথা আছে শোন।

বর্ত্তমান যুগে রেডিয়াম কথাটা প্রায়ই আমরা শুনি—কেমন ? কিন্তু আসলে এই রেডিয়ামটা কী ? রেডিয়াম আবিষ্কৃত হবার আগে বৈজ্ঞানিক আরি আতোয়ান বেকেরল "ইউরোনিয়াম" Uranium নামে একপ্রকার মৌলিক পদার্থের মধ্যে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেন। সেই ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে 'ইউরোনিয়াম যুক্ত' কোন পদার্থ যদি ফটোগ্রাফির প্লেটের উপর রাখা যায় তবে অন্ধকার ঘরের মধ্যেও সেই প্লেটগুলো নষ্ট বা সংক্ষুব্দ হয়ে যায় অর্থাৎ তার উপরে আর ফটো তোলা যায় না। সেই ইউরোনিয়াম যুক্ত রক্ষিত পদার্থটীর ছবি সেই প্লেটটার গায়ে ফুটে ওঠে। তিনি আরো দেখলেন পিচ্‌লেণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী খনিজ পদার্থ এইভাবে ফটোগ্রাফির প্লেটের উপর রাখলে আরো বেশী দাগ পড়ে সেই প্লেটগুলোতে। মিঃ বেকেরেল জগতের অন্যতমা আধুনিক শ্রেষ্ঠ নারী বৈজ্ঞানিক। মাদামকুরীকে তাঁর এই

আবিষ্কারের কথা জানান এবং তাকে তিনি এই বিষয় নিয়ে আরো ভাল করে পরীক্ষা করবার জন্য অনুরোধ করেন। মাদামকুরীও বেকেরেলের আদেশ মাথায় তুলে নিয়ে—পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে এমন কী বস্তু আছে যার জন্য ফটোগ্রাফির প্লেটের গায়ে ছবি পড়ে,—সেটা জানবার জন্য গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন।

মাদামকুরী হচ্ছেন পোলাণ্ডের অন্তর্গত ওয়ারস নগরের একজন দরিদ্র অধ্যাপকের মেয়ে; এর আসল নাম হচ্ছে মারী সাক্লোডোসকা। মারীর যখন খুব অল্প বয়েস তখন তার মা মারা যায়। মা-হারা এই মেয়েটীকে অধ্যাপক অত্যন্ত ভালবাসতেন। সর্ব্বদাই নিজের কাছে কাছে রাখতেন। তারপর একটু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মারী বাপের গবেষণাগারে ঘুরে ঘুরে বাপকে একটু-আধটু সাহায্য করত; গবেষণাগারে অদ্ভুত অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতী ও নানা রং বেরঙের ওষুধ পত্র তার শিশু মনকে একান্ত কৌতূহলী করে তুলত; সে স্থির দৃষ্টিতে অবাক হয়ে বাপের কাজ দেখতো; শিশু বয়েসের সেই বিস্ময়কর কৌতূহলই পরবর্ত্তী জীবনে এই মেয়েটীর বুকে যে জ্ঞানের অদম্য স্পৃহা জাগিয়ে দিয়েছিল, তাই থেকেই বর্ত্তমান বিজ্ঞান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বস্তু রেডিয়াম আবিষ্কৃত হয়।

বাপের সঙ্গে সঙ্গে মারীও এটা ওটা নেড়ে চেড়ে দেখত। অধ্যাপকের ছাত্ররা মারীর এই কৌতূহল দেখে তার নাম দিয়েছিলো ‘ক্ষুদে অধ্যাপক’।

এমনি করেই দিন যাচ্ছিল। পোলাণ্ড তখন রাশিয়ার পদানত।

পোলাণ্ডের তরুণ তরুণীরা তখন পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে ফেলে নূতন করে আবার স্বাধীন পোলাণ্ড গড়ে তোলবার রঙীন স্বপ্ন দেখছে ; তরুণী মারীও্ এই দলের একজন ছিল এবং তার ফলে তাকে কিছুদিনের মধ্যেই বাধ্য হয়ে স্বদেশ ছেড়ে যেতে হয়। এই সময় সে প্যারী নগরে এসে আশ্রয় নেয়, এবং নানা বিষয় পড়াশুনা আরম্ভ করে।

সেই সময় মারী বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সোরবন জড়বিজ্ঞান ল্যাবোরেটরীতে ভর্ত্তি হয়। সেইখানে তরুণ বৈজ্ঞানিক পিয়ের কুরীর সঙ্গে মারীর বিয়ে হয়ে গেল।

স্বামী স্ত্রী দু'জনে একসঙ্গে বিজ্ঞানের গবেষণা আরম্ভ করলেন।

বেকেরেলের অসমাপ্ত গবেষণা নিয়ে দু'জনে কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গবেষণার কাজ চালাতে হলে টাকার প্রয়োজন ; কোথায় টাকা পাওয়া যায় ? অষ্ট্রিয়া সরকারের অধীনে পিচব্লেণ্ডের খনি ছিল ; অনেক লেখালেখির পর সরকার ধূলা বালি মাখা একখণ্ড অত্যন্ত নিকৃষ্ট পিচব্লেণ্ড ওদের দিলেন ! তাই নিয়েই দুজনে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দু'জনে নিঃশব্দে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতেন ! এইভাবে সুদীর্ঘ দু বছর পিচব্লেণ্ড নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করবার পর পিচব্লেণ্ড হতে বিস্‌মাথ (Bismith) যুক্ত এক প্রকার পদার্থ আবিষ্কার করলেন, এবং দেখা গেল এই নব আবিষ্কৃত পদার্থটীও

গবেষণাগারে রেডিয়াম আবিষ্কর্তা মাদাম কুরী।

ঘূর্ণীয়মান নিহারীকা হতে নব নব তারকার জন্ম রহস্য।

ইউরেনিয়ামের মত স্বতঃ আলোকদানকারী অর্থাৎ যার গা হতে আপনা হতেই আলো বের হয়। ইংরেজীতে এই ধরণের বস্তুকে রেডিও একটিভ্ (Radio active) বলে। একটা কথা মনে রেখ—ইউরেনিয়াম যুক্ত পদার্থ ফটোগ্রাফির প্লেটগুলোকে সংক্ষুব্দ করেছিল; তার কারণ হচ্ছে—ওর গা হতে আপনা হতেই আলো বের হয়! কিন্তু কুরী দেখলেন এই নব আবিষ্কৃত পদার্থটী ইউরেনিয়াম হতেও ৩০০ শত গুণ বেশী শক্তিশালী। এর নাম দিলেন 'পোলোনিয়ম'।

এতেই তাঁরা সন্তুষ্ট হলেন না; পোলোনিয়মকেও নানা ভাবে পরীক্ষার করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন, এবং ঐ ভাবে বার বার পরিষ্কৃত ও শোধন করতে করতে তাঁরা এমন একটা সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ বের করলেন যার গুণ দেখে তাঁরা একেবারে নির্ব্বাক হয়ে গেলেন। সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থের সল্পবিশিষ্ট অংশই হচ্ছে "রেডিয়াম"।

এইভাবে তাঁদের সুদীর্ঘ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলো।

তাঁদের ঐ অসামান্য আবিষ্কারের জন্যই ১৯০০ সালে বৈজ্ঞানিক বেকেরেলের সঙ্গে তাঁদেরও 'নোবেল' পুরস্কার দেওয়া হয়! এবং শুধু তাই নয় ১৯১০ খৃষ্টাব্দেও আবার মাদামকুরী নোবেল পুরস্কার পান। এই রেডিয়াম যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে কি প্রভূত উন্নতি করেছে তা সত্যই আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর। রেডিয়াম আবিষ্কৃত হবার পূর্ব্বে দুরন্ত ক্যানসার রোগের কোন ওষুধই ছিল না, এই রেডিয়ামের স্বতঃ-বিসারি আলোর দ্বারা

আজকাল সেই রোগ চিকিৎসা করা হয়। এ ছাড়াও আরো অনেক রকমে রেডিয়ামকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহার করা হয়!

—বার—

তোমরা জান সূর্য্য অত্যন্ত উত্তপ্ত জিনিষ! কেননা যদিও সূর্য্য আমাদের কাছ থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে থাকে, তবুও তার তেজ আমরা এত দূর হতেও বেশ বুঝতে পারি। খালি গায়ে রোদে একটু ঘুরলেই পিঠ্‌ দিয়ে যেন আগুনের মত উত্তাপ বেরুতে থাকে। গ্রীষ্মকালে রোদের তাপে আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড় হয়। বৈজ্ঞানিকেরাও নানা উপায়ে পরীক্ষা করে অনুমান করেছেন যে, সূর্য্যের বাইরেটারই উত্তপ্ততা হল তাপমানের প্রায় ৬০০০ হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড্‌। সাধারণ অবস্থায় জলকে গরম করলে যখন তাপমানের ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্‌ হয় তখনই জল ফুট্‌তে সুরু করে দেয়,—তবেই বুঝে দেখ ৬০০০ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্‌ উত্তপ্ততা ব্যাপারটা কী? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, সূর্য্য হ'তে যে সাদা আলো আমরা পাই সেটার উৎপত্তির মূলে আছে ঐ সূর্য্যের ৬০০০ হাজার ডিগ্রী উত্তাপ। আলো সম্বন্ধে বলবার সময় বলেছিলাম—তোমাদের হয়ত মনে থাকতে পারে; এই শাদা আলোর মধ্যে লাল, পীত, সবুজ, নীল, ভায়লেট প্রভৃতি সাতটা রং এক সাথে মিশে আছে, এবং তাদের উপস্থিতি কেমন করে বোঝা যায় সে কথাও বলেছি! তবে একটা কথা এই যে, কেমন করে তাপ হতে আলো বের হতে

পারে ? Electric bulbয়ের সময় 'তারকে' উত্তপ্ত করে আলো পাওয়া যায় সে কথাও নিশ্চয়ই ভোলোনি ; তবে ভেবেই দেখ সূর্য্যের ঐ ৬০০০ হাজার ডিগ্রি উত্তাপ থেকে যে সাদা আলো পাই সে কথাটাও তাহলে বৈজ্ঞানিকদের মতে বাস্তবিকই সত্য !
—কেমন ?

তোমরা টাঙ্‌ষ্টেন (Tungsten) দিয়ে ইলেকট্রিক বালবের ফিলামেণ্ট তৈরী করে তার মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিত কর, তবে দেখবে ক্রমে সেটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ও আলো দেখা দেয়। সেই আলোই আমাদের ঘরে ঘরে সুইচ্‌ টিপে পাই। প্রথমে যখন টাঙ্‌ষ্টেন দিয়ে ভিতরে বিদ্যুৎ চালিত করে সেটাকে উত্তপ্ত করা হয় তখন সেটা ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠ্‌তে থাকে, তারপর ক্রমে গরম হতে হতে সেটা লাল হয়ে ওঠে, এবং যতই বিদ্যুৎ প্রবাহ তার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে থাকে ততই সেটা আরও গরম হয়ে হল্‌দে হয়ে যায়, এবং আরো বেশী গরম হলে ক্রমে ক্রমে সাদা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তাঁরা লক্ষ করেছেন যখন অল্প গরম থাকে তখন ক্রমে লাল হয় আর যখন খুব বেশী উত্তপ্ত হয় তখন ক্রমে ক্রমে সাদা হয়ে ওঠে, আর এই সময়েই তখন লাল, পীত, সবুজ, নীল ইত্যাদি সব রংগুলোই ওর থেকে বের হতে থাকে। যখন এই টাঙ্‌ষ্টেন হতে আলো বের হয়—(অর্থাৎ আমাদের ঘরের ইলেকট্রিক বাল্‌বের আলো জ্বলে) তখন এর উত্তাপ হয় প্রায় ২২০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত।

বৈজ্ঞানিকরা টাঙ্‌ষ্টেনকে এই ভাবে উত্তপ্ত করে পরীক্ষা

করতে করতে দেখেছেন যে, টাঙষ্টেন থেকে ক্রমে, লাল, হলদে, সবুজ, নীল, ও ভায়োলেট রং এর আলো পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ভায়োলেট রংয়ের আলোর পরও অনেক রকম আলো আছে, সেগুলোকে আলট্রাভায়োলেট্ আলো বলা হয়। এ আলো আমরা চোখে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু যন্ত্রের মধ্যে ধরা পড়ে।

আমরা আজকাল সকলের মুখেই একটা কথা শুনি। সূর্য্যের আলোয় 'আলট্রাভায়োলেট্' রশ্মি আমাদের দেহের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। সেই জন্যই 'আলট্রাভায়োলেট্ রে' কে নিরাময়রশ্মি বলা হয়ে থাকে।

অতি সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে সময়ে সময়ে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আজ পর্য্যন্ত হচ্ছে তা জানতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

সামান্য একটা পারদ পূর্ণ কাচের নলের উপরি ভাগে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাতে চালাতে রণ্টাজেন X' Ray আবিষ্কার করলেন। ভারতে আসবার পথ খুঁজতে গিয়ে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন; চায়ের কেটলীর জল গরম দেখতে দেখতে একদিন বাষ্পীয় যান আবিষ্কারের পথ খোলসা হয়ে গেল। তেমনি সূর্য্যের আলোর নিরাময় শক্তি আবিষ্কারের মূলেও ঐ রকম একটা সুন্দর ইতিহাস আছে।

কোন হাসপাতালে একদিন দেখা গেল, যে সমস্ত শিশু সূর্য্য কিরণ সেবন করার সুযোগ বা সৌভাগ্য লাভ করেছে তারা অন্য শিশুদের তুলনায় অনেক আগেই সেরে সুস্থ হয়ে উঠ্ছে।

ডাক্তার বৈজ্ঞানিকের দল এই ব্যাপার দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন; এবং ভাবতে সুরু করলেন এর কারণ কী? তাঁদের মনে হলো নিশ্চয়ই সূর্য্যের রশ্মির মধ্যে এমন একটা কিছু লুকিয়ে আছে যা মানুষের দেহে ওষুধের মত কাজ করে,—মানুষের রোগ সারিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। তখন তাঁরা কতকগুলো সাদা ইঁদুর নিয়ে তাদের কয়েকটার গায়ে সূর্য্যের আলো লাগিয়ে আর কতকগুলোর গায়ে না লাগ্‌তে দিয়ে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে,সূর্য্যের আলোর মধ্যে আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মির রোগ সারিয়ে দেবার একটা বিশিষ্ট ক্ষমতা আছে এবং সেই জন্য ঐ রশ্মির নাম রাখলেন নিরাময় রশ্মি। কিন্তু এই নিরাময় রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে (Wave length) খুব ছোট। তাঁরা এও পরীক্ষা করে দেখলেন —এই রশ্মি কাচ ভেদ করে যেতে পারে না। গ্রীণল্যাণ্ড, লেপল্যাণ্ড প্রভৃতি রৌদ্র বিরল প্রদেশে কৃত্রিম উপায়ে এই নিরাময় রশ্মি উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে।

মানুষের দেহে আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মি যে ঠিক কি ভাবে কাজ করে তা কিন্তু অনেক গবেষনা করা সত্বেও ভাল করে জানা বা শোনা যায় নি। সে সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু বলা যায়—ঐ কিরণ মানুষের চামড়ার ভিতরে গিয়ে রক্তের সংগঠন বদলিয়ে দেয়! জার্ম্ম—বিষক্রিয়া প্রভৃতি হতে মানুষের দেহকে রক্ষা করে! এই আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মির দ্বারা বাত ভাল করা যায়, ক্ষত স্থান খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ওঠে এবং আরোগ্যমুখী রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

নগ্ন দেহের ওপর আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মি যদি ফেলা যায় তবে রক্ত-চাপ (Blood-pressure) কমে যায়, শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বাভাবিক হতে থাকে। আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মি শরীরের ক্যাপিলারী (নালিকাগুলিকে) আয়তনে বড় ও বলশালী করে দেয়, শাদা ও লাল রক্ত কণিকা (Blood corpusculusর সংখ্যাও বৃদ্ধি করে! এই রশ্মি ক্ষয় রোগে (Tuberclusis) দেহের রক্তাংশের চূণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে 'টিউবার কিউল' নামক জার্ম্ম নষ্ট করে। এইসব নানা রকম উপায়ে দেহও ক্রমশঃ সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে। এখানে একটা কথা সকলেরই সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত, সূর্য্যালোক সেবনের সময় দেহ যাতে খুব বেশী উত্তপ্ত না হয়ে ওঠে সেদিকেও নজর রাখা দরকার। আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মির সাহায্যে চিকিৎসা করার একটা হিড়িক লেগে গেছে, কিন্তু এই রশ্মি দ্বারা চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য! সেই জন্য মধ্যবিত্তদের কাছে আজও এই রশ্মি-চিকিৎসা—'বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার মতই' আকাশ কুসুম সম হয়ে আছে! আমাদের দেশেও সূর্য্যালোক সেবন করবার প্রচলন অনেক কাল হতেই ছিল; আজকালও দেখা যায় পাড়াগাঁয়ে আমাদের ঠাকুরমারা নব জাত শিশুকে তেল মাখিয়ে রোদে শুইয়ে রাখেন। বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার ডি, এল্ রায়এর একটা ভারি মজার গান আছে,—হয়ত শুনেছো।

"বিষ্যুদ বারের বার বেলাতে আমার জন্ম হইল
মায়া দিল রোদে ধরে

কালো করে আর

মাখিয়ে মাখিয়ে তেল !”

গায়ত্রী ও সন্ধ্যা মন্ত্র হতে জানা যায় যে, উহা প্রধানতঃ সূর্য্যের উপাসনা।

আচ্ছা এখন এই আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মির সম্বন্ধে আরও একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলি। তোমাদের আগেই বলেছি বৈজ্ঞানিকরা টাঙ্‌ষ্টেনকে উত্তপ্ত করে ‘আলট্রাভায়োলেট্-রে’ আবিষ্কার করেছেন।

বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন টাঙ্‌স্টেন যখন উত্তপ্ত হতে হতে তাপমাণের ৩০০০ হাজার ডিগ্রীতে পৌঁছয়, সে তখন এত ‘আলট্রাভায়োলেট্রে’ ছড়ায় যে, সে আলোর তেজে মানুষের গায়ের ছাল চামড়া পুড়ে যায়। তিন হাজার ডিগ্রী উত্তাপেই যদি এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে, তবে সূর্য্যের ছয় হাজার ডিগ্রী উত্তাপ থেকে যে আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মি নির্গত হয় তার ক্ষমতা যে কত বেশী সে কথা ভাবতে গেলেও ত’ গা শিউরে ওঠে। ‘একা রামে রক্ষে নেই তাতে আবার সুগ্রীব দোসর।’

কিন্তু আসলে দেখতে গেলে ঠিক তাও হয় না। বৈজ্ঞানিকরা বল্‌লেন, সূর্য্যের ছয় হাজার ডিগ্রী উত্তাপ হতে যে আলট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মি আসে সেই তেজ যদি সত্যি পৃথিবীতে আসতে পারত তবে নাকি পৃথিবীর যে, সব চাইতে বড় প্রাণী সেও নাকি জীবনধারণ করতে পারত না, পুড়ে একদম ছাই হয়ে যেত। অথচ একথাও তাঁরা অস্বীকার করছেন না যে, সূর্য্যের বাইরেটার

উত্তপ্ততা ছয় হাজার ডিগ্রী; এবং তাই যদি হয় তার এই উত্তপ্ততা হতে যে আলো আসবে তার মধ্যে আলট্রাভায়োলেট্ আলোর পরিমাণও অত্যন্ত প্রচুর হবেই। মাত্র তিন হাজার ডিগ্রীর উত্তপ্ততার 'আলট্রাভায়োলেট্ রে'র যে কি ভীষণ ক্ষমতা তা আমাদের জানা আছে—আর সূর্য্যের আলোও আমরা পাচ্ছি, কিন্তু তবু ত' আমাদের কোন অনিষ্ট হয় না; এর কারণ কি? তবে কি আমরা যে সূর্য্যের আলো পাই এর মধ্যে আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মি নেই? না তাও না। সূর্য্যের আলোর মধ্যে আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মি আছে, তবে ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটু মজা আছে। শোন: বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখলেন সূর্য্যের আলো সূর্য্য হতে বেরিয়ে প্রথমে শূন্যের মধ্যে দিয়ে ছুটে চল্‌ল; এখন এই শূন্যের মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে করে সূর্য্যের আলোর আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মি সূর্য্যের আলো হতে চুরী করে নিতে পারে; তারপর সেই আলো সূর্য্যের বায়ুমণ্ডলে এসে প্রবেশ করল; বৈজ্ঞানিকরা বায়ুমণ্ডলকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন; কিন্তু না! তার মধ্যেও অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন্, নিওন, আর্গন, ক্রিপটন্, জেনোন অনেক কিছুই আছে কিন্তু এদের মধ্যে কারোরই চুরীর অভ্যাস নেই, এবং শুধু তাই নয় বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যে জলের বাষ্প ও কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড্ আছে তাদেরও ত' চুরী করার অভ্যাস নেই তবে কে এমন মানুষের বন্ধু আছে যে এমনি করে অদৃশ্য সূর্য্যের আলো হতে আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মি চুরী করে নিয়ে নিত্য

কোটি কোটি প্রাণীকে এমনি করে অবসম্ভাবী মৃত্যুর হাত হতে বাঁচিয়ে রাখছে! সেই অদৃশ্য উপকারী বন্ধুটীর নাম হচ্ছে 'ওজন'। এও একরকম গ্যাস! অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন্ প্রভৃতির মত।

আসলে ওজন গ্যাস সূর্য্য-রশ্মির আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মির অংশ; প্রায় সমস্তটা শুষে নিলেও সম্পূর্ণ একেবারে শুষে নিতে পারে না। কিছুটা তাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। এবং সেইটাই আলট্রাভায়োলেট্ রশ্মি ভাবে আমরা পাই।

—তের—

সেদিন দুপুরের দিকে ঘরে ঢুকে দেখি দাদা একটা সাদা কাচের গ্লাসের গায়ে ছোট একটা সরু কাঠি দিয়ে আঘাত করে করে সুন্দর একটা মিষ্টি সুর বাজাচ্ছেন; আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখে হেসে বললেন, এস গজ, কমলি আজ তোমাদের কাচের জয় যাত্রার কাহিনী শোনাব!…ন ভেতব্যম্!...কথা শুনে ভয় করো না—শোন।

আমরা দাদার মুখে সংস্কৃত শুনে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলাম।

দাদা বলতে সুরু করলেন ঃ—

আজকাল যেমন চার পয়সায় একটা কাচের গ্লাস পাওয়া যায়

ও দুই পয়সা হলেই একটা কাচের বাটী পাওয়া যায়, চিরদিন কিন্তু কাচের তৈরী জিনিষ এমনি সস্তা ছিল না। এমনও একদিন গেছে যখন রাজা বাদশারাই কেবল সৌখীনতার জন্য কাচের তৈরী জিনিষপত্র ব্যবহার করতে পারতেন। গরীব দুঃখীদের কাছে কাচের জিনিষপত্র স্বপ্নের মতই ছিল। কিন্তু কেমন করে সেই বহুমূল্য কাচ আজ এত সহজ-লভ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই কথাই আজ তোমাদের বলব। বহুকাল আগে একবার সিডেনের কয়েকজন ব্যবসায়ী প্রকাণ্ড এক বালুচরে তাদের নৌকা নোঙ্গর করে সেখানে রাখার বন্দোবস্ত করল। নির্জ্জন বালুবেলা; দূরে নীল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সূর্য্যের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে! এই নির্জ্জন জায়গায় উনুন কোথায় পাওয়া যাবে! অগত্যা কয়েকজনে বালি দিয়ে উনুন তৈরী করে তার উপর আগুণ জ্বালিয়ে রান্না চাপিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য্য—সহসা কয়েকজনের চোখ একটা মজার ব্যাপারে পড়তেই সকলে যুগপৎ চমকে উঠল। বালির উনানের কিছুটা অংশ আর আগেকার মত বালির নেই, নূতন একটা চক্‌চকে জিনিষে পরিণত হয়েছে। সে জিনিষটা তারা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখলে, সেটা বেশ শক্ত অথচ স্বচ্ছ;...অর্থাৎ তার ভিতর দিয়ে আলো দেখা যায়। এই ব্যাপারে সকলে ভারী চম্‌কে গেল; ভাবলে কি জানি এটা আবার কোন ডাইনী বা যাদুকরের দেশ ত নয়? তা না হলে একি অদ্ভূত আশ্চর্য্য ব্যাপার?...যা হোক এই অদ্ভুত ব্যাপারটা তারা খুব গোপনে নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিল।

এই অদ্ভুত স্বচ্ছ বস্তুটী কী জান? কাচ! মাত্র মেডিটেরি-নিয়ানের উপকূল হতে স্পেন পর্য্যন্ত এই অজানা অদ্ভুত বস্তুর প্রচলন হলো! অন্যান্য দেশ এ সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে বা বুঝতে পারলে না।

কিন্তু এত গোপনতা সত্ত্বেও ইটালী কায়দা ও কৌশল করে এই তত্ত্ব জেনে নিল এবং কালক্রমে 'ভেনিস' কাচ তৈরীর একটা প্রধান স্থান হয়ে দাঁড়াল। 'ভেনিস' এর এই কাচ সমগ্র সভ্যজগতকে একদিন চমৎকৃত ও অভিভূত করেছিল। কি করে সেই বালি হতে কাচ হয়েছিল জান? আসলে কাচ কোন ধাতু নয়। রসায়ন প্রকৃতির কতকগুলো পদার্থ যেমন silica সিলিকা, বোরিকএসিড্ (যা আমরা ঘায়ে দিয়ে থাকি) ও ফস্ফোরিক এ্যাসিড্ প্রভৃতি সোডা যা আমরা কাপড় কাচা প্রভৃতিতে ব্যবহার করি—সাদা ময়দা গুঁড়ার মত দেখতে, পটাস, চুণ, (লাইম) ম্যাগ্নেসিয়া, জিঙ্ক-অকসাইড, লেড-অকসাইড ইত্যাদি বস্তুর সঙ্গে একত্রে মিশিয়ে আগুনে গরম করলেই উত্তাপে তরল হয়ে কাচ তৈরী হয়। ঐ যে সিলিকার কথা বল্লাম—ওটা—পাথরের কুচি, জ্বালান পাথরের গুঁড়ো, ময়দা বা সাধারণ বালি বই আর কিছু না! এখন বালু বেলার বালি ত ছিলই এবং কাচ তৈরী হতে যে যে বস্তুর প্রয়োজন তাও ছিল, সেইজন্যই আগুনের উত্তাপে গলে কাচ তৈরী হয়েছিল!

হাঁ—যা বলছিলাম ভিনিসিয়ানরা কাচ তৈরী কৌশল শিখলে

এবং প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত তারা সেটা গোপন করে রাখলে। শুধু তাই নয় এ রহস্য যাতে অন্য কেউ না জানতে পারে তার জন্য গুরুতর শাস্তি—এমন কি প্রাণদণ্ডের পর্য্যন্ত অনুমতি দেওয়া হল!

এইভাবে ত্রয়োদশ শতাব্দী কি তার চাইতেও বেশী এই কাচ তৈরী করবার কৌশল জগতের অন্যান্য জাতের কাছ হতে সযতনে গোপন করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু 'বোহেমিয়ান' বা ইংরাজ তাদের এ কৌশল জেনে নিল! তারা আরো উন্নত ধরণের কাচ প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করলে। এই দেখে ভেনিসিয়ানরা বেশ জব্দ হয়ে গেল।

আগে যে কাচ তৈরী হতো সেটা মাঝে মাঝে কালো দেখতে হতো এবং ভেতরে আঁশ আঁশ মত কি কি যেন সব থাকত। ভিনিসিয়ানরা এক রকম নূতন ধরণের কাচ তৈরী করবার কৌশল বের করলে—যাতে করে ঐ সকল দোষ আর থাকল না! সেইজন্য ঐ সময়কার কাচ প্রস্তুতকারীরা কাচ নির্ম্মিত নানারূপ সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী করে সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে দিল।

১৬১০ খৃঃ হতে ১৬১৬ খৃঃ এই কয় বৎসরের মধ্যেই প্রস্তুত প্রণালীর মধ্যে যেন একটা নূতন ধারা এল। এই সময় Sir William Slingsby এবং আরো কয়েক জন কাচ প্রস্তুত প্রণালীর মধ্যে পটাস্ (Potas) ও সীসা (lead) ব্যবহার করতে সুরু করে নূতন ধরণের কাচ প্রস্তুত করলেন। ফরাসীরা যে কাচ

তৈরী করেছিল তার থেকে Sir William Slingsby নির্ম্মিত কাচ অনেক স্বচ্ছ ও সুন্দর হল। এটা খুব সহজে গলান যেত এবং গলিয়ে জিনিষপত্র তৈরী করাও বেশ সহজ হত। এই কাচের নাম দেওয়া হল ফ্লিন্ট কাচ (Flint glass)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে Schot ও Abbe নামে দুজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক জেনা কাচ (Jena glass) আবিষ্কার করলেন। এই কাচ বোরিক এ্যাসিড্ ও সিলিকার দ্বারা তৈরী করা হয় বলে এর নাম দেওয়া হল Barium অথবা বোরো সিলিকেট বা ক্রাউন কাচ!

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষ হাতেই কাচ তৈরী করত; কিন্তু মহাযুদ্ধের পর হতে কাচ 'অটোমেটিক মেসিনে' তৈরী করা হচ্ছে! কাচ তৈরীর জন্য এমন উন্নত প্রণালীর যন্ত্র তৈরী হয়েছে যে, এখন ঘণ্টায় একই রকমের হাজার হাজার শিশি বোতল তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

ইজিপ্টের মত আমাদের ভারতবর্ষেও কাচ তৈরীর ইতিহাস খুব পরিষ্কার নয়। কেউ কেউ বলে থাকেন যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হতেই ভারতবাসীরা কাচ তৈরী করত। কেননা খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে Pliny ভারতীয় কাচকে Superior quality বলে বর্ণনা করে গেছেন; এবং শুধু তাই নয় বর্ত্তমান ভু-তত্ত্ববিদ্‌রা ঐ সময় কাচের চুড়ী প্রভৃতি ভারতে ব্যবহৃত হত বলে স্বীকার করেন! ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতে কাচের শিশি ও চুড়ী তৈরীর কারখানা ছিল একথাও জানা যায়। মোগল

বাদশাদের দরবারে কাচের ঝাড় লণ্ঠনের বর্ণনাও পাওয়া যায়। এসব হতে বেশ স্পষ্টই কী বোঝা যায় না যে একদিন ভারত-বাসীরাও কাচ প্রস্তুত প্রণালী জানত ? এবং নিশ্চয়ই চর্চ্চার অভাবে ক্রমে সেটা তারা ভুলে গিয়েছিল। ভারতের অতীত গৌরবের পৃষ্ঠাগুলি ওল্টালে অনেক কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায়। বিদ্যায়, অর্থে, গৌরবে, যশে, সাধনায় একদিন যে এই ভারতভূমি পৃথিবীর সকল জাতীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল একথা অস্বীকার করতে গেলে শুধু গায়ের জোরেই করা হবে ! রামায়ণে আমরা পুষ্পক রথের বর্ণনা পাই ; নিশ্চয়ই সেই সময় ঐ ধরণের কোন যানবাহন ছিল, না হলে সাহিত্যে সে তথ্য স্থান পেল কী করে ? আজ পাশ্চাত্য জগতে উড়োজাহাজ Aeroplane আবিষ্কার করে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে ! কিন্তু ভারতবাসীরা এ অসাধ্য সাধন কত আগেই না করেছিল !

হাঁ—যা বলছিলাম খুব পুরাতন সংস্কৃত কাব্যে দেখতে পাই 'কাচখণ্ডকে মণি বলে ভুল করো না'। অর্থাৎ কাচকে সাধারণ চোখে মণির মতই দেখাত। এর থেকেও ত প্রমাণ পাওয়া যায় যে তখনও কাচের প্রচলন এদেশে ছিল এবং তার দামও ছিল খুব বেশী।

আচ্ছা দাদামণি আয়নাটাও কাচ দিয়েই তৈরী করা হয় ? কিন্তু যখন আয়না ছিল না তখন লোকে আয়নার কাজ চালাত কিসে ? কমলি প্রশ্ন করল।

হাঁ—বর্ত্তমানে পুরু কাচের পিছনে পারদের (Murcury)

একটা আবরণ coating দিয়ে আয়না তৈরী করা হয়! গল্পে আছে আগেকার দিনে আয়না যখন আবিষ্কৃত হয়নি, তখন গ্রীসে এক সুন্দরী মেয়ে ঝরণার জলে তার নিজের ছায়া দেখে এত বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিল যে সেখান হতে নড়তেই পারেনি। কেউ কেউ বলেন আয়না আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে মেয়েরা একটা পাত্রে জল রেখে কেশ প্রসাধনের কাজ চালাত। সাধারণতঃ তৈরী করবার প্রণালী ও উপাদান অনুসারে কাচকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) বোতলের কাচ—বালি, লাইম (চূণ) এবং এ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী করা হয়, এর নাম সাধারণ কাচ।

(খ) ক্রাউন কাচ—বালি, লাইম (চূণ) এবং সোডা।

(গ) বোরোসিলিকেট্ ক্রাউন কাচ—বোরিক এ্যাসিড এবং সিলিকা।

(ঘ) বেহিমিয়ান্ বা শক্ত কাচ—বালি, পাথরের কুচি, লাইম (চূণ) এবং পটাশ দিয়ে তৈরী করা হয়—এর কথা আগেই বলেছি!

(ঙ) সোডা লাইম কাচ,—সোডা কাচ বা নরম কাচ, সোডিয়াম কিম্বা ক্যাল্সিয়াম সিলিকেট দিয়ে তৈরী হয়। খুব সহজেই গলে যায় বলে একে নরম কাচও বলে। সেইজন্যই ফুঁ দিয়ে বা হাত দিয়ে সামান্য উত্তাপেই এই কাচ হতে জিনিষ তৈরী করা যেতে পারে। এ কাচ দামেও খুব সস্তা। কিন্তু মূল্যবান কাচের মত এই কাচও বর্ণহীন ও স্বচ্ছ অবস্থায়

পাওয়া যায় বলে এই কাচ হতেই কাচের জানালা প্রভৃতি জিনিষ তৈরী করা হয়।

(চ) কাট কাচ বা বেলোয়ারী কাচ—এই কাচ হতেই বেলোয়ারী কাচের চুড়ী প্রভৃতি তৈরী করা হয়ে থাকে।

অস্বচ্ছ, ঘোলাটে বা রঙিন কাচ তৈরী করতে বিভিন্ন ব্যবস্থার দরকার হয় না। ঐ সব কাচ তৈরী করবার সময় মাল মশলার মধ্যে বিভিন্ন রঙ্ দেবার ব্যবস্থা করা হয় মাত্র।

(ছ) কোন কিছু মুড়ে রাখবার জন্য যে সব কাচ তৈরী করা হয় তাকে জল কাচ (water glass) বলে।

ব্লোন কাচকে উত্তপ্ত বা গলিত অবস্থায় পাইপের সাহায্যে ফুঁ দিয়ে কাচের কুঁজো তৈরী করা হয়।

রাসায়নিক ল্যাবোরেটারীতে রসায়ন পরীক্ষার জন্য যে সব পাত্র বা আধারের প্রয়োজন হয়, যেমন Flask, Test tube ইত্যাদি—আবার যে সব কাচ আলোতে স্বচ্ছ থাকে অর্থাৎ চিকিৎসা বিদ্যা-চর্চ্চার একান্ত প্রয়োজনায় যেমন 'থার্ম্মোমিটার', —উহারা আলাদা এক শ্রেণীর কাচ এবং কেবল ঐ সব কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ত গেল কাচ তৈরী করবার একটা মোটামুটি ইতিহাস। কিন্তু আমরা সাধারণত যে সব কাচের তৈরী জিনিষ ব্যবহার করে থাকি তাতে যেমন সুবিধাও আছে তেমনি অসুবিধাও কম নেই।

কাচ অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর; পড়লেই কিংবা একটু জোরে আঘাত লেগেছেকি আর রক্ষে নেই, অমনি টুক্ করে ভেঙ্গে বসে আছে!

তা ছাড়া ভাঙ্গা কাচে হাত পা কেটে রক্তারক্তি হয়! এই সব ভেবে ভেবেই বৈজ্ঞানিকরা এমন কাচ বের করলেন যা সহজে ভঙ্গুর নয় ও যা ভাঙ্গলে ধারালো টুকরো বের হয় না এবং যাতে করে হাত পা কেটে রক্তারক্তি হওয়ারও সম্ভাবনা কম থাকে!

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে আমেরিকার এক ল্যাবোরেটারীতে একদিন দেখা গেল, ল্যাবোরেটারীর সমস্ত সভ্যরা ঘরে সানের শক্ত মেঝের উপর কেবল কাচ ছুঁড়ছেন আর আনন্দে নৃত্য করছেন। যারা এই মজার ব্যাপার একটু দুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তারাও বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, একটু পরে তারাও এসে যোগ দিল।

চশমার কাচের মত পাতলা কাচ আট দশ ফিট্ ওপরে ছুড়ে দিয়ে তাঁরা দেখেছেন, কাচটা ভাঙ্গে কি না, কিন্তু আশ্চর্য্য— কাচটা ভাঙ্গল না। তাঁরা আনন্দিত ও মুগ্ধ হলেন! এবং এও পরীক্ষা করে দেখলেন যে সাধারণ আঘাতের চাইতে তের চোদ্দ গুণ বেশী আঘাত ঐ কাচ সহ্য করতে পারে। আরো একটা মজা যে ঐ কাচ ভাঙ্গলে ধারালো টুকরো বের হয় না।

এই কাচ এক অভিনব প্রণালীতে তৈরী করা হয়েছিল। ইংরাজীতে যাকে annealingএর প্রণালী বলা হয়ে থাকে। সেটা হচ্ছে তরল অবস্থা হতে খুব আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করা হয়। কিন্তু শক্ত কাচ তৈরী করতে হলে প্রায় ১৫০০ ডিগ্রী উত্তাপে জিনিষগুলো গলিয়ে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বাতাসের সাহায্যে বা ৪০০ ডিগ্রী উত্তপ্ত তেলের মধ্যে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করে নেওয়া হয়! তার ফলে

ঐ কাচের বাইরের পর্দ্দাটা (bayer) খুব তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে যায় এবং ভিতরের অংশটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসার জন্য উপরের ঐ পর্দ্দাটার সঙ্গে একেবারে আঁকড়িয়ে পড়ে। এই শ্রেণীর শক্ত কাচ দিয়ে চশমার কাচ প্রভৃতি তৈরী হয় এবং ওগুলো সহজে ভাঙ্গে না ও ভাঙ্গলেও ক্ষতি হবার তেমন সম্ভাবনা থাকে না।

আমেরিকাতে আজকাল স্প্রিং বোর্ড, সুইং সিট ইত্যাদি প্লেট কাচ দিয়ে ঐ সকল তৈরী হয়ে থাকে।

আসলে কাচের ঐ রংয়ের জন্য রাসায়নিক ক্রিয়ারই সম্পূর্ণ সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। তোমাদের আগেই বলেছি রসায়ন প্রকৃতির কতকগুলি পদার্থ যেমন সিলিকা, (পাথরের কুচি, জ্বালান পাথরের গুঁড়ো, সাদা বা সাধারণ বালি) পটাশ, চূন, ম্যাগনেশিয়া প্রভৃতি বস্তুগুলোকে আগুণে গরম করলে, ঐগুলি একটা মিশ্র তরল জিনিষে পরিণত হয়। ঐ তরল পদার্থ টা আবার চঞ্চল, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না! ঠিক কত খানি অর্থাৎ কত ডিগ্রীর উত্তাপ পেলে ঐ বস্তুগুলো গলে তরল আকার ধারণ করতে পারে তার কোন বাধা ধরা নিয়ম কানুন নেই। উত্তাপের সঙ্গে ক্রমে কাচ তরল হয়ে আসে, এবং যত ঠাণ্ডা হতে থাকে তত ঘনীভূত হয়ে আঠার মত চট্‌চটে হয়ে যায়। মানুষ প্রয়োজন মত ঐ তরল অবস্থা হতে নানারূপ কাচের জিনিষ তৈরী করে নেয়।

যখন কাচকে নানা রংয়ের তৈরী করবার প্রয়োজন হয় তখন

উত্তাপ দেওয়ার আগে কাঁচা মাল মশলার সঙ্গে আবশ্যকীয় রংয়ের জন্য আবশ্যকীয় পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া হয়; তারপর যখন উত্তাপে গলে তরল আকার ধারণ করে তখন সেই বিশিষ্ট ভাবে মিশ্রিত পদার্থের রং পায়।

১। কালো রংয়ের কাচ তৈরী করতে হলে, সাধারণতঃ কোবাল্ট, ম্যাগ্নানিজ এবং আয়রণ (লোহা) অক্সাইড্ মিশিয়ে দেওয়া হয়।

২। নীল রং—কোবালট্, পটাসিয়ম ডিক্রামেট ও কপার অক্সাইড্!

৩। মেটে বা কটা রং—নিকেল, ম্যাগ্নানিজ, অথবা আয়রণ অকসাইড্ মিশিয়ে দেওয়া হয়।

৪। লাল রং—সেলিনিয়াম ক্যাড্মিয়াম, সাল্ফাইড্ বা 'কপার' ছাড়া বা উহার সংমিশ্রণে।

কাচ যেমন নানাবিধ রংয়ের তৈরী করা যেতে পারে তেমনি কাচকে প্রয়োজন অনুসারে অস্বচ্ছ ও (opaue) করা যেতে পারে। এর বেলায় কিন্তু কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না! তা ছাড়া কাচ হতে কোন কিছুর দাগ তোলবার জন্যও নানা উপায় আছে। যে সকল রসায়ন এই জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাদের মধ্যে আরসিনিক, ম্যাঙ্গানিজ ডায়ক্সাইড্; নিকেল অক্সাইড, সেলেনিয়াম্, নাইটার ইত্যাদি। বড় বড় আয়না, জানালার কাচ, রেইন ফোর্সড কাচ প্রভৃতিকে 'প্লেট কাচ' বলে। এরই অংশকে আবার ক্রাউন কাচ বলে। উচ্চ শ্রেণীর

শিশি, বোতল, বোতল কাচ বা সাধারণ কাচ দিয়ে তৈরী হয় না, ফ্লিণ্ট্ কাচ দিয়ে তৈরী হয়।

টেবিলের ওপর রাখবার কাচ, এনামেল করা কাচ, কাচের সৌখিন আসবাব পত্র—এসব 'বোহিমিয়ান' বোরো সিলিকেট ফ্লিণ্ট কাচ দিয়ে তৈরী করা হয়। এগুলিকে সাধারণতঃ টেবিল কাচ বলে!

বিদ্যুতের বাল্‌ব প্রভৃতির জন্য বোরো সিলিকেট বা ক্রাউন কাচ প্রয়োজন হয়। বাজারে যে সমস্ত 'নকল মুক্তো' দেখা যায় সে সব অধিকাংশই 'ফ্লিণ্ট' কিংবা বোরো সিলিকেট কাচ দিয়ে তৈরী!

আর এক ধরণের কাচ আছে যা সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়না, তাকে 'ভারবস্ত' বা 'ডুরাকস' কাচ বলে; এর থেকে ষ্টীম বয়লারের জন্য, জাহাজ কিংবা খনিতে যে সব শক্ত কাচের দরকার হয় সেই সব তৈরী হয়।

আবার এক ধরণের কাচ আছে যেগুলির উত্তাপ সহ্য করবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা আছে; সেই সব কিন্তু সাধারণ কাচ দিয়ে তৈরী করলে মট্ করে ভেঙ্গে যায় বলে এগুলি টেম্‌পারেড্ কাচ দিয়ে তৈরী করা হয়। সাধারণ কাচ হতে এগুলি পাঁচ গুণ বেশী শক্ত।

একটা কথা মনে রেখ, টেম্‌পারেড্ কাচ একবার তৈরী হলে তার থেকে আর সাইজ মত কিছু তৈরী করা যায় না। আজকাল এমন কাচও তৈরী হয়েছে যা ইট পাথর ছুঁড়লেও ভাঙ্গে না,

রদ্দুরে গরম হয়না; এই রকম কাচ দিয়েই ঘর বাড়ী তৈরী করে মানুষ বসবাস করে।

আমরা যেমন মাটী, পিতল বা এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির তৈরী হাঁড়িতে রান্না করি তেমনি আধুনিক 'বোরো সিলিকেট' কাচ হতে তৈরী হাঁড়িতে অনেক দেশে রান্না করে খায়।

কিছুদিন আগে আমেরিকায় সাবানের বুদ্‌বুদের মত পাতলা সুক্ষ্মতম কাচের গোলক তৈরী হয়েছে। পীড়া আরোগ্যের জন্য এই কাচের গোলকের ভিতর দিয়ে সূর্য্যরশ্মি রোগক্রান্ত স্থানে প্রতিফলিত করা হয়।

বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কারের গোড়াতে এই কাচেরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে, যেমন, 'একস্ রে'—'দুরবীন্' 'অনুবীক্ষণ' আরো কত কী!

কাচের সম্বন্ধে আরো অনেক সুন্দর কথা আছে, সে সব কথা যত পড়বে তত জানবে! যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান স্পৃহাই মানুষকে উন্নতির সোপানে এগিয়ে দেয়! যে বিজ্ঞান বিস্ময় আজ জলে, স্থলে, শূন্যে সর্ব্বত্রই অপূর্ব্ব মায়াজাল সৃষ্টি করছে—তার উদ্ভাবনার মূলে আছে মনিষীদের বুদ্ধি ও চিরন্তন জ্ঞানস্পৃহা। এস আজ আমরা তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে মাথা নোয়াই। তাঁরা শুধু কোন বিশিষ্ট দেশ বা জাতিরই বন্ধু নন,—সমগ্র জাতির, সর্ব্ব দেশের ও বিশ্ব মানবের প্রিয় ও আপনার!

—শেষ—

এই লেখকের লেখা আরও বই

কায়াহীনের প্রতিশোধ

আমাদের শরীরের গল্প

বালুচরের বিভিষীকা

কালো ভ্রমর (প্রথম ভাগ)

রাজ কুমার

রাখী বন্ধন

কালো ভ্রমর (দ্বিতীয় ভাগ)

মরণের পথে